প্রকাশনার ৩৫ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

পঁয়ত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ৮
আগস্ট ২০২০ ॥ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭ ॥ জিলহজ-মুহাররম ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক
আনিস মাহমুদ

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : publicationifa@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

জাতীয় শোক দিবস

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এই দিনে একদল বিপদগামী সেনা অফিসারের হাতে তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনসহ সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্নিপুরুষ ও স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মহান স্থপতি। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্বমানচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম। বাঙালি জাতি পেয়েছে তার চির অস্তিত্বের ঠিকানা। জনগণের কল্যাণে নিবেদিত এই নিরলস কর্মবীরের সীমাহীন আত্মত্যাগ ইতিহাসে অতুলনীয়। তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন, সাধনা ও অব্যাহত সংগ্রামের ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

আগস্টের সেই কালোরাতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতির পিতাসহ সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি জানাই বেদনাঘন শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। জাতীয় শোক দিবসে আমাদের প্রত্যাশা ১৫ আগস্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ায় সকলেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যাব। সেই শোক বিহবল মাসে মহান আল্লাহর কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ প্রত্যেকের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সাথে মহান আল্লাহ যেন তাদের প্রত্যেককে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন।

মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মেলন পবিত্র হজ্জ-এর মাধ্যমে বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে খানায়ে কাবায় বর্ণ-গোত্র, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন বন্ধনে তৌহিদী ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হন। এই ঐক্য উম্মাহ্র বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করুক, পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে আল্লাহর্ নিকট আমরা এই মুনাজাত করি। আমীন!

সূচি

প্রবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা/ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ♦ ০৭
বঙ্গবন্ধু ও ওআইসি সম্মেলন/ অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ ♦ ১০
বঙ্গবন্ধু হত্যা : ইতিহাস কিসিঞ্জারের বিচার করবে/মোহাম্মদ শাহজাহান ♦ ১২
মহান নেতার মহত্তম স্বপ্নগুলো/ মুস্তাফা মাসুদ ♦ ২১
মুজিববর্ষ : জয় বাংলার ইতিবৃত্ত এবং বঙ্গবন্ধু/ খালেক বিন জয়েনউদদীন ♦ ২৬
জাতির পিতার জীবনকথা/ প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন ♦ ৩১
ইসলামের খেদমতে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে অবদান/ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ♦ ৪২
১৫ আগস্ট, অতঃপর কিছু ভাবনা/ মুহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার বাদল ♦ ৫৩
বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু/ আখতার হামিদ খান ♦ ৬০
মুজিব বর্ষের আলোকে আমাদের বাংলাদেশ/ মিলন সব্যসাচী ♦ ৬৮
মধুমতির খোকা/ ইমরুল কায়েস ♦ ৭৩
বঙ্গবন্ধু : ছড়া-কবিতায়/ দেলওয়ার বিন রশিদ ♦ ৭৭
হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য/ ড. আবদুল জলীল ♦ ১০৯
করোনা ও কুরবানী/ মুফতী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ♦ ১২০

গল্প

ন্যাশন ৫৭০/ মনি হায়দার ♦ ৯১
মুজিবের মুক্তি ও একটি কাঁচামাটির হাঁড়ি/ শামস সাইদ ♦ ৯৯

কবিতা

আজও নীল বাংলার আকাশ তাই হয়ে ওঠে লাল/ সৈয়দ শামসুল হক ♦ ৮৩
শোণিতে এঁকেছে স্বদেশের মুখ/ সোহরাব পাশা ♦ ৮৪
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ/ বাবুল তালুকদার ♦ ৮৫
কবিতায় গল্পে মুজিব/ খান চমন-ই-এলাহি ♦ ৮৬
আমার পিতার নাম শেখ মুজিব/ মিজানুর রহমান মিথুন ♦ ৮৭
তিনিই জাতির জনক/ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী ♦ ৮৮
বঙ্গবন্ধু/ আবুল হোসেন আজাদ ♦ ৮৯
বত্রিশ নম্বর/ শফিক তালুকদার ♦ ৯০

পরশমণি

আল-কুরআন

১। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯)

২। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তোমরা তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। অথচ তোমরা অনুভব করতে পার না। (সূরা বাকারা : ১৫৪)

৩। এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন হত্যার বিনিময় অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি একটা প্রাণ বাঁচালো সে যেন গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করলো। (সূরা মায়িদা : ৩২)

৪। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন। (সূরা নিসা : ৯৩)

৫। তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে, যা কিছু তারা জমা করে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও দয়া সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৭)

৬। ফেতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও গুরুতর। (সূরা বাকারা : ১৯১)

আল-হাদীস

১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো পছন্দ হোক বা অপছন্দ সর্বাবস্থায় আমীরের কথা শোনা ও মান্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হলে তখন আর তার কথা শোনা ও মান্য করা যাবে না।

২। নবী করীম (সা) বলেন, শহীদ ব্যক্তির নিজ পরিবার থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে। (আবু দাউদ)

৩। তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, একে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করবে না, পরস্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। আর আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। (মুসলিম)

৪। একজন মু'মিনকে হত্যা করা অপেক্ষা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিকতর সহনীয়। (ইবনে মাযাহ)

৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর গ্রন্থ আল-কুরআন এবং সর্বোত্তম আদর্শ হলো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ। (সহীহ বুখারী)

৬। প্রত্যেক জিনিসেরই পরিচ্ছন্ন করার উপায় রয়েছে, আর অন্তর পরিষ্কার করার উপায় হলো আল্লাহর যিকির। (বায়হাকী শরীফ)

সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

আমি প্রথমে শোকের মাস আগস্ট মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ১৫ আগস্টের সেই কালো রাতে যাকে আমরা বঙ্গজননী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি, তিনি সহ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সেই সাথে আমার দু'জন বন্ধু, দীর্ঘদিন আমরা এক সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে কাজ করেছি, তারা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি ছিলেন, সাহসী মানুষ সামীম মোহাম্মদ আফজাল। তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো, বাংলাদেশের সৃষ্টি। বাংলাদেশের সৃষ্টির পেছনে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মানবিকতা বোধ কাজ করেছিল, অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটা প্রবণতা কাজ করেছে। ইসলামের মানবতার ডাক প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছে। মানবিক গুণাবলির কারণে যে পাকিস্তানের জন্য উনিও সংগ্রাম করেছেন, সেই পাকিস্তানের প্রতি মোহ ভঙ্গ হতে সময় লাগেনি। মাত্র ১ থেকে দেড় বছর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হয়েছে।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ১৯৪৯ সালে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে সংগঠন করে পাকিস্তানের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির শুরুতে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছেন। যখন তার সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করার সুযোগ হয়েছিল দলীয় রাজনীতিতে, ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, আওয়ামী লীগের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে (যদিও কারাগার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন)। তিনি কিন্তু ইসলামে যে মানবিক মূল্যবোধ আছে তার দ্বারা তাড়িত হয়ে পাকিস্তানের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ভাষার পক্ষে কথা বলেছেন। নবী করিম (সা) ভাষার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সঙ্গে ইসলামের এই সমস্ত দর্শনের প্রচণ্ড মিল পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু যখন সুযোগ পেলেন। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। যারা মুসলমানদের জন্য কাজ করছিল সেগুলো একীভূত করে বঙ্গবন্ধু একটি ফাউন্ডেশন তৈরি করেন। তার মধ্যে ছিল ইসলামিক একাডেমি, বায়তুল মোকাররম এর আলাদা সংগঠন ছিল। বায়তুল ফালাহ মসজিদের আলাদা সংগঠন ছিল। ১৯৭৫ সালে এগুলোকে একত্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন করেন। এটা আমরা সকলেই জানি।

মাদ্রাসা শিক্ষা কিন্তু উনার নজর এড়িয়ে যায়নি। মাদ্রাসা বোর্ডকে আধুনিকায়ন ও সাজিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। মানুষদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং দেখেন আমাদের দেশে যারা তাবলীগ জামাত করেন তারা বলেন যে, তারা ইসলামের কাজ করে। তাদের এই বক্তব্যের সাথে বঙ্গবন্ধু ঐক্যমত পোষণ করতেন বলেই রমনাতে কাকরাইল মসজিদ আছে। এই তাবলীগ জামাতের জন্য কিন্তু তিনি এই জায়গাটা বরাদ্দ করেছিলেন। আপনারা অবাক হতে পারেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন ১৯৯৬ সালে। এখানে তাবলীগ জামাতের যারা মুরব্বীরা ছিলেন তারা যখন আবেদন করলেন যে সম্প্রসারণ করা দরকার, এতে রমনা পার্কের কোন সৌন্দর্য ব্যাহত হবেনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের সাথে আমিও যুক্ত ছিলাম। তিনি জমি দিয়ে সম্প্রসারণ করেছেন। পিতা জায়গা দিয়েছিলেন আর তিনি সম্প্রসারণের জন্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আপনি দেখেন তাবলীগ জামাতের জন্য টঙ্গিতে যে বিশাল এস্তেমা ময়দান এটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অবদান। এখন তাবলীগ জামাত তারা নিজেরা মারামারি করে। কি করে না করে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতকে সৎ উদ্দেশ্যে এই জায়গাটা দিয়ে যান। যাতে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে ধর্ম পালনের সুযোগ

পায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। দোয়া খায়ের করে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারে। এগুলো বঙ্গবন্ধু করে গেছেন।

আমি মনে করি যে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের যে মিডিয়াগুলো আছে– ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া (বেতার, তখন বিটিভিও হয়ে গেছে) সেখানে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিনের সূচনা করা হয়। আমার যতটুকু মনে পড়ে পাকিস্তান আমলে এটি ছিল না। বঙ্গবন্ধু ইসলামের সত্যিকারের চিত্র, রূপকে তুলে ধরার জন্য, মানুষের সামনে পৌঁছে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন। আপনারা জানেন যে সৌদি আরব যখন হজের ব্যাপারে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্গবন্ধু তখন হজের ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ থেকে হজে যেতে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট দিয়ে যেতে হতো। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সৌদি বাদশাহর সাথে কথা বলে কিন্তু সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ইসলাম একটি পবিত্র মহান ধর্ম, ইসলাম ধর্মে সেক্যুলারিজম রয়েছে। ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনা। যার যার ধর্ম তাকে পালন করতে দেয়। বঙ্গবন্ধুকে ইসলাম বিরোধী প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। মারাত্মক অপপ্রচার চালিয়েছিল। যারা চালিয়েছেন তারা ইসলামের বন্ধু না। এছাড়াও আরো অনেকগুলো কথা আছে যেমন ধরেন বঙ্গবন্ধু জুয়া খেলা বন্ধ করেন। পৃথিবীর অনেক দেশে তথাকথিত ইসলামি দেশে জুয়া খেলা হয়। বঙ্গবন্ধু আইন করে জুয়া খেলা বন্ধ করেন। মাদকদ্রব্য সেবন আইন করে বন্ধ করে দেন। দরিদ্র মানুষের জন্য অভিশাপ ছিল ঘোড়দৌড়। এটাও ইসলাম বিরোধী, এখানে জুয়া খেলা হতো এবং দরিদ্র মানুষের ক্ষতি করতো। সেজন্য সেটাও বন্ধ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যেটা করেছেন, সঠিক কাজ করেছেন।♦

(শোকের আগস্ট মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তৈরি করা ‘ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাননীয় গভর্নরের বক্তব্য)

বঙ্গবন্ধু ও ওআইসি সম্মেলন

অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং আমরা এই যে বিশেষণটি ব্যবহার করছি, তিনি এক অর্থে ত্রিকালদর্শী। প্রস্তাব যখন আসলো লাহোরে যেতে হবে। আমাদের দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে যে নৈকট্য এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে অবস্থান সেটি আমাদেরকে স্ট্যাটাজিকালি এই জায়গাটায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং পুরো বিষয়টি তিনি খুব দ্রুততার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন। আমাদের জাতীয় চার নেতাদের অন্যতম যারা উনার আশপাশে সহযোগি হিসেবে ছিলেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছেন। মূলত তার একক সিদ্ধান্তে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং সবাইকে অবাক করে তিনি হাজির হয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক লাহোরে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। যে শর্তের উপর ভিত্তি করে আমাদের উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছিল ভারত। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান। স্বাধীন রাজ্যগুলোকে তিনটি অপশন দেয়া হয়েছিল। ভারত কিংবা পাকিস্তানে এই দুই রাষ্ট্রে যোগদান করবার জন্য অথবা স্বাধীন থাকবার জন্য। এই রকম একটি ডামাডোলের মধ্যে তখন কিন্তু লাহোর খুব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রাক্কালে যে লাহোর প্রস্তাব– মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র পত্তনের যে ঘোষণা ছিল তা লাহোর থেকে ঘোষিত হয়েছিল। লাহোরে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি, সেখানে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসের বিকাশের মধ্যে দিয়ে এই প্রেক্ষিতটি রচিত হয়েছিল।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আরব ইসরাইল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। তারপর যে তেল সংকট তার মধ্যে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

আসলে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের সরকার প্রধান এবং জনগণের মধ্যে ভুল ধারণা বিরাজমান ছিল। এর একটি কারণ হচ্ছে পাকিস্তানিরা ভযাবহ অপপ্রচার চালিয়েছিল। বিষয়টি এরকম যে, বাংলাদেশ আন্দোলনটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের ষড়যন্ত্রের ফসল এবং মুসলিম উম্মাহর সংহতি দুর্বল করার জন্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে দুইটি উইং তা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারলে মুসলিম উম্মাহ কম জোর হয়ে যাবে। সুতরাং এই কারণে অবস্থাটি তৈরি হয়েছে। এটা ব্যাপকভাবে প্রচারণা করবার কারণে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, সৌদি আরবের মতো রক্ষণশীল দেশ যারা উদ্যোগ নিয়ে ওআইসিটা শুরু করেছে, তাদের মধ্যে মাইন্ড সেটটি ছিল নেতিবাচক। এই বিষয়টি তারা কমিউনিকেশনে নিয়েছেন। এই জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রনায়কোচিত এবং দুরদর্শি চিন্তা থেকে ওআইসিতে গিয়েছিলেন। তিনি এটিও চিন্তা করেছিলেন আমাদের পরম বন্ধু রাষ্ট্র ভারত আমাদের ভুল বুঝতে পারে। আমরা অসময়ের বন্ধুকে ভুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে, একক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু যেহেতু জাতির পিতা তিনি সকল রকমের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানের লাহোরে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি যে বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন সেটি হলো, নয়মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানের যে অপপ্রচারটি চলছিল সেটি তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের মতো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রটা তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন।

ভুলে গেলে চলবে না আরব ইসরাইল যুদ্ধ যখন চলছিল সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু কূটনীতি, শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরুপ একটি কাজ করেছিলেন। তিনি চা এবং মেডিকেল টিম পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে যে বার্তাটি তিনি প্রদান করেছিলেন তাকে ডিপ্লোমেসি বলা হয়ে থাকে।

পরবর্তীতে ৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিলিস্তিনিদের যে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম তাতে আমরা বাঙ্গালি জাতি পরিপূর্ণভাবে সংহতি প্রকাশ করেছি। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে, যে কোন নিপীড়িত জাতির পাশে বাঙ্গালি জাতি দাঁড়াতে প্রস্তুত। কারণ আমরা এরকম একটি প্রক্রিয়া পদ্ধতির স্বাধিকার অর্জন করেছি।♦

(শোকের আগস্ট মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তৈরি করা 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের বক্তব্য)

বঙ্গবন্ধু হত্যা : ইতিহাস কিসিঞ্জারের বিচার করবে

মোহাম্মদ শাহজাহান*

বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্রে বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার। মুজিব হত্যার ৫ দিনের মাথায় ২০ আগস্ট খুনী মোশতাককে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিহিংসাপরায়ণ কিসিঞ্জার এতটাই উল্লসিত হন যে, তিনি বলেন, মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করছি। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বিভিন্ন দলিল থেকে অকাট্য প্রমাণ মিলে যে মোশতাক সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দিতে কিসিঞ্জার সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। খুনীদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান কিসিঞ্জার। কিসিঞ্জার আরো বলেন, 'স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছানো, যাতে তারা ভরসা পায় যে আমরা তাদের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবো। তাদের স্বীকৃতি দেব।'

স্বাধীনতা লাভের সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর রাতে পরিবারের সদস্যসহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান এবং তাদের দোসরদের উপেক্ষা করে মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে নিজের দেশকে স্বাধীন করে ১৯৭১ সালেই মুজিব বিশ্ব নেতায় পরিণত হন। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের কাছে শুধু পাকিস্তান পরাজিত হয়নি, খোদ যুক্তরাষ্ট্রই পরাজিত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের কয়েক ঘণ্টা আগে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা ফারল্যান্ড ৩২ নম্বর বাসভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। দেশী-বিদেশী অনেকেরই ধারণা ছিল মুজিব ওইদিন রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। ফারল্যান্ড আমেরিকার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, 'পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা তারা একেবারেই চান না।' কিন্তু মার্কিন হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে শেখ মুজিব তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে প্রকারান্তরে দেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। পাকিস্তানী কামান, বন্দুক-মেশিনগানের মুখে ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে বঙ্গশার্দুল শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিজয়ী বীরের বেশে শেখ মুজিব ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বদেশে

ফিরে আসেন। কিসিঞ্জারের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পরবর্তীকালে বলেছেন, 'আমেরিকা ও তার ঘনিষ্ঠ পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে পরাজিত করে মুজিবের বিজয় মার্কিন শাসকবর্গের কাছে ছিল বিব্রতকর ও লজ্জাজনক।' ড. কিসিঞ্জার একাত্তরের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা ভুলতে পারেননি। পরিবারের সদস্যসহ মুজিবকে হত্যার মাধ্যমে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় কিসিঞ্জার-ভুট্টো চক্র।

কিসিঞ্জার ও তাঁর দোসররা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চরম বিরোধিতা করেন। সে সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক, পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী ও বিশেষ সহকারী তাহের উদ্দিন ঠাকুর গোপনে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করে কিসিঞ্জার গং-এর সাথে। এক পর্যায়ে মোশতাকের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরের পর তাকে আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়নি। সেই অপমানের জ্বালা মোশতাক ভুলতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিবকে হত্যার জন্য কিসিঞ্জার পুনরায় মোশতাক চক্রের সাথে চক্রান্ত শুরু করেন। মুজিবকে হত্যা করা মানে বাংলাদেশকে হত্যা করা। কারণ মুজিব বাংলার– বাংলা মুজিবের। কিসিঞ্জার-মোশতাক গং-এর চক্রান্ত ও যোগাযোগ এতটাই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল যে, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভোরে ঘাতক প্রেসিডেন্ট মোশতাকের পাশেই ছিলেন একাত্তরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাহবুব আলম চাষী ও তাহের উদ্দিন ঠাকুর।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। ১৫ আগস্ট মোশতাককে রাষ্ট্রপতি করা হলেও কিসিঞ্জার-ভুট্টো চক্রের পছন্দের আসল লোকটি ছিলেন জিয়াউর রহমান। মুজিব হত্যার পর সেনাবাহিনীকে সামাল দেওয়ার জন্য জে. জিয়ার প্রয়োজন ছিল। আর কৌশলগত কারণেই ১৫ আগস্ট জিয়াকে প্রেসিডেন্ট করা হয়নি। জিয়া প্রেসিডেন্ট হলে সবাই ধরে নিতো জিয়া চক্রান্তের সাথে জড়িত ছিল। মোশতাককে ডামি হিসেবে ১৫ আগস্ট ক্ষমতায় বসানো হয়। ৩ মাসের মাথায় কলার খোসার মতো মোশতাককে সরিয়ে জিয়াকে ক্ষমতায় আনা হয়। দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, মার্কিন অবমুক্ত দলিল এবং লিফশুলজের গবেষণায় উঠে এসেছে মুজিব হত্যায় জিয়াউর রহমানের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কথা। ২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে লিফশুলজ বলেন, "আমার অভিমত, জিয়া তার ব্যক্তিগত কারণেই ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেননি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটি ছিল তারই এজেন্ডা, যা তিনি ও অন্য কিছু অফিসার জানতেন। কেননা আমি বিশ্বাস করি, জিয়ার সুস্পষ্ট সমর্থন ছাড়া মুজিব হত্যাকাণ্ড সফল হতো না, এমনকি তারা এগুতেই সাহস পেতো না। তাইতো জিয়াই এই হত্যাকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ 'ছায়া মানুষ'।"

কথায় বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' বঙ্গবন্ধু হত্যা-ষড়যন্ত্রে জড়িতদের নাম আবার ওঠে এসেছে মার্কিন অবমুক্ত করা দলিলে। বঙ্গবন্ধু হত্যার সাড়ে তিন

দশক পর অবমুক্ত করা এই মার্কিন দলিলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক প্রথম আলোতে ২০০৯-এর ১১ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ৮টি সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মিজানুর রহমান খান এই প্রতিবেদন প্রকাশ করতে গিয়ে হত্যা-ষড়যন্ত্রের সময় মার্কিন প্রশাসনে কর্মরত কোনো কোনো কর্মকর্তার সাথেও কথা বলেছেন। প্রথম আলোতে প্রকাশিত এসব তথ্য ২০০৮ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ১০টি পর্বে দৈনিক সমকালেও প্রকাশিত হয়েছিল।

সপরিবারে বাঙালি জাতির জনক হত্যাকাণ্ডে বিদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ভূমিকায় ছিলেন ড. হেনরি কিসিঞ্জার ও ভুট্টো। এসব দলিলে দেখা যায়, শেখ মুজিবকে হত্যার ব্যাপারে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কিসিঞ্জার। এমনকি ১৫ আগস্ট ভোর রাতে কুলাঙ্গাররা যখন ৩২ নম্বর বাসভবনে হত্যা অভিযান চালাচ্ছে– সেই মুহূর্তেও সুদূর আমেরিকা থেকে কিসিঞ্জার খোঁজখবর রাখছিলেন। মোশতাক-জিয়ার লেলিয়ে দেয়া কয়েকজন কুলাঙ্গার বিপথগামী সেনা সদস্য ২টি ইউনিট নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার ওয়াশিংটন সময় সকাল ৮টায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়ে স্টাফ সভায় বসেন। ঢাকার খবর জানার জন্য উদগ্রীব কিসিঞ্জার বৈঠকের শুরুতেই বলেন, 'আমরা এখন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কথা বলবো।' নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন সভায় বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেন, 'এটা হচ্ছে সুপরিকল্পিত ও নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করা অভ্যুত্থান।' কিসিঞ্জার জানতে চান, 'মুজিবুর কি জীবিত না মৃত?' আথারটন বলেন, 'মুজিব মৃত। তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠসহ পরিবারের কয়েকজন সদস্য, ভাই, ভাগ্নে নিহত হয়েছেন।' কিসিঞ্জার এই সভায় বসার আগেও ঐদিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বলেন, 'আমি ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ (আইএনআর) থেকে আরো ভালো খবর পেয়েছি। তিনি ঐ কর্মকর্তার সঙ্গে ওয়াশিংটনে আগেই কথা বলেছেন। তবে তাদের কথাবার্তা ফোনে নাকি সরাসরি হয়েছে তা তিনি বলেননি। নরাধম কিসিঞ্জারের ভালো খবর হচ্ছে আমাদের জাতির পিতাকে হত্যার খবর।

ব্যুরো পরিচালক উইলিয়াম জি হিল্যান্ড কিসিঞ্জারকে জানান, 'আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, তখনো তিনি (শেখ মুজিব) নিহত হননি।' কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা? তারা কি কিছু সময় পর তাকে হত্যা করেছে?' এর জবাবে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন বলেন, "আমরা যতদূর জানি– আমি বলতে পারি না যে, আমরা বিস্তারিত সবকিছু জেনে গেছি। কিন্তু ইঙ্গিত ছিল তাঁকে হত্যা-পরিকল্পনা বিষয়েই। তারা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা করে।" ওয়াশিংটন সময় সকাল আটটায় বাংলাদেশের ঘটনাবলী

নিয়ে স্টাফ সভায় মিলিত হওয়া এবং তারও আগে মুজিব হত্যা সম্পর্কে আথারটনের সাথে কিসিঞ্জিারের তৎপরতা থেকে বুঝা গেল সে ওই রাতে কিসিঞ্জার ঘুমাননি। হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

যদ্দূর জানা যায়, ১৯৭৫ সালে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বোস্টার মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রে খুবই সক্রিয় ছিলেন। আর বাংলাদেশে মোশতাক, জিয়া, ফারুক-রশীদ চক্র তাদের বিদেশী প্রভুদের ভৃত্য হিসেবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করেছে। বোস্টার গং ঢাকায় খুনি চক্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এমনকি ১৫ আগস্ট ভোররাতে হত্যাযজ্ঞ চলাকালে ঢাকার রাজপথে বোস্টারকে তার গাড়িতে ঘুরতে দেখা গেছে। সোজা কথায়, হাজার হাজার মাইলের পথ সুদূর ওয়াশিংটন থেকে কিসিঞ্জার এবং ঢাকা থেকে বোস্টার মুজিব হত্যাকাণ্ড সরাসরি তদারকি করেছেন। তারপর বোস্টার ঘন ঘন বার্তা পাঠিয়ে ঢাকার পরিস্থিতি ওয়াশিংটনকে অবহিত করেন। মার্কিন দূতাবাস তাদের বার্তায় ঘাতক চক্র কর্তৃক বাংলাদেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যার মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে উল্লেখ করেছে। যদিও ১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না। ১৫ আগস্ট এক বার্তায় বোস্টার ওয়াশিংটনকে জানায়, “সকাল ১১টা পর্যন্ত অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, ঢাকা বা বাইরে কোথাও কোনো গোলযোগ হয়নি। তবুও আমরা কিছু প্রতিরোধের আশঙ্কা এখনই নাকচ করে দিচ্ছি না। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। বেতার মাধ্যমে সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর ও পুলিশ প্রধানরা সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে বিবৃতি প্রচার করেছেন।”

তবে ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার পর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ না হওয়াটা ঢাকা থেকে প্রেরিত মার্কিন বার্তায় বারবার ওঠে এসেছে। কয়েকটি কারণে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হয়নি। এক. বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে– একথাটিই অনেকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাছাড়া বেতারে জাতির জনকের হত্যার খবর শুনে দলীয় নেতাকর্মীসহ জনগণ হতভম্ব হয়ে যায়। দুই. বঙ্গবন্ধু হত্যায় কয়েকজন চাকরিরত ও চাকরিচ্যুত মেজরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ২টি মাত্র ইউনিট অংশ নেয়। কিন্তু সকাল ১০টার মধ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানসহ অন্য সকল বাহিনীপ্রধানদের খুনি সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থনের ঘোষণা বেতার-টিভিতে প্রচারিত হওয়ায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলকারী খুনি মোশতাক ও তার মন্ত্রীরা সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী। ঢাকায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্যাংক মোতায়েন, কারফিউ জারি এবং সঙ্গীন উঁচিয়ে সেনা টহলে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য ও সহকর্মী এবং দলীয় নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে গৃহবন্দী করা হয়, অনেকে

মন্ত্রী হলেন আর বাকিরা পালিয়ে আত্মগোপন করেন। এসব কারণে খুনি চক্র ১৫ আগস্ট তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়নি।

বোস্টার ঐদিন আরেকটি বার্তায় লিখেছে : "ঢাকায় এখন বিকেল চারটা। তেমন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল। রাস্তাগুলো শান্ত, লোক চলাচল খুবই কম, যানবাহন নেই বললেই চলে, দু'ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল ছিল এবং রাস্তায় সেনা টহল রয়েছে।" ১৬ আগস্ট বোস্টার আরেক বার্তায় খন্দকার মোশতাককে আমেরিকাপন্থী হিসেব উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে দৃশ্যত যে দু'জন বিদেশী নেতা উল্লসিত হন, তাদের একজন হলেন কিসিঞ্জার, অন্যজন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টো। স্বাধীনতার দু'বছর পর বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোশতাকের অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘাতক সরকারকে সবার আগে স্বীকৃতি দেয় ভুট্টো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় 'ইসলামিক রিপাবলিক বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তৃতীয় বিশ্ব এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। খুশীতে ডগমগ ভুট্টো ১৫ আগস্ট আরো ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তান শীঘ্রই বাংলাদেশে ৫০ হাজার টন চাউল, ১ কোটি গজ মোটা কাপড় এবং ৫০ লাখ গজ মিহি কাপড় উপহার হিসেবে প্রেরণ করবে।' ভুট্টো বলার আগে ঘাতক মেজর ডালিম ১৫ আগস্ট সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' হিসেবে প্রচার করে। অবমুক্ত দলিলে বলা হয়, 'মুজিব হত্যার পর ভুট্টোর উত্তেজনা এতটাই তীব্র হয়েছিল যে, তিনি বাংলাদেশের নাম পাল্টে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রাখেন এবং শিশু ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আবেদন জানান।' কিন্তু ১৬ আগস্ট ঢাকা বেতার দেশের নাম পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করে। এর পরেও ভুট্টো হাল ছাড়েননি। মোশতাক সরকারের প্রতি দূতিয়ালি করতে তিনি সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব সফর করেন। তবে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের কথা ভুট্টো আগে থেকেই জানতেন। ১৯৭৫ এর জুনে কাকুলের পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ভুট্টো বলেন, 'এ অঞ্চলে শিগগিরই কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।' *(জুলফিকার ভুট্টো অব পাকিস্তান, স্ট্যানলি ওলপার্ট)।*

অবমুক্ত মার্কিন দলিলের বর্ণনা অনুযায়ী মুজিব হত্যার পরে ও অক্টোবরের আগে খন্দকার মোশতাক নিযুক্ত নয়া সেনাপ্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমান এবং ফারুক-রশীদ কথিত ভারতীয় হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে অস্ত্র সহায়তা চেয়েছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মোশতাক, জিয়া গং নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। মোশতাক-জিয়া-ফারুক-রশিদ চক্রের এমন আশঙ্কাও ছিল, যে কোনো সময় ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারে। ভারতকে তাদের কথিত হস্তক্ষেপ থেকে নিষ্ক্রিয় রাখতে বাংলাদেশের খুনি চক্র এবং পাকিস্তানের ভুট্টো মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে ঘন ঘন ধরনা দিচ্ছিল। কিন্তু ওদের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দেননি বোস্টার। একটিবারের জন্যও বোস্টার বলেননি,

ভারত হস্তক্ষেপ করলে যুক্তরাষ্ট্র তা ঠেকিয়ে রাখবে। ৭ নভেম্বর কথিত সিপাহী-বিপ্লবের দিনে জে. জিয়া ভারতীয় কথিত হামলা ঠেকিয়ে রাখতে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিবকে সকালেই মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করেন। দুপুরে মোশতাকের মুখ্য সচিব মাহবুব আলম চাষী সরাসরি ফোন করেন বোস্টারকে। অনুনয় একটিই– 'ভারত ঠেকান।' কিন্তু ভারত-জুজু ছড়ানো যে বাস্তব ছিল না, কৌশলগত ছিল, তা স্পষ্ট করেন বোস্টার স্বয়ং। ঐ সময় ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন হামলায় আহত হলে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। জিয়াউর রহমান তখন সাহায্যের জন্য আবার মার্কিন সরকারের কাছে ধরনা দেন।

মিজানুর রহমান খান লিখেছেন : প্রাপ্ত মার্কিন নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, "জেনারেল জিয়াউর রহমান সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসনকে একান্ত আপন মনে করেছিলেন। ৭ নভেম্বর জিয়া ক্ষমতা নিয়েই তাঁর দূতকে বোস্টারের কাছে পাঠান। ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার জবাবে বোস্টার এ সময় জিয়াকে পুরনো বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন। বার্তাটি ছিল এরকম : 'বাংলাদেশটা পাকিস্তানপন্থী, ইসলামপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে গেছে। ভারত এখন বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাতে পারে। এটা ঠেকাতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন চাই।' ১৯৭৫ সালে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ৮১ দিনের মাথায় ক্ষমতা নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই ছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রথম বার্তা।" (দৈনিক প্রথম আলো, ১৬.৮.০৯)। জে. জিয়া '৭৫-এর ৭ নভেম্বর থেকেই উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দেশ শাসন শুরু করেন। আর ক্ষমতা নিয়েই ভারত-জুজুর ভয়ে ভীত জিয়া মার্কিন সরকারকে জানান দেন– 'বাংলাদেশ পাকিস্তানপন্থী, ইসলামপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে গেছে।' এই একটিমাত্র বাক্য থেকেই বুঝা যায়, বীরোত্তম খেতাবধারী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অনুপ্রবেশকারী ছিলেন। অবমুক্ত দলিলে বলা হয়, ১৯৭২ সালেই মেজর ফারুক রহমান রহস্যজনকভাবে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই রশীদ একইভাবে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মার্কিন দূতাবাসে যান। রশীদ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে সেখানে যান। ঐ ঘটনার দু'বছরের মাথায় মুজিববিহীন বাংলাদেশে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলা প্রতিহত করতে ফারুক-রশীদ ও জিয়াউর রহমান আলাদাভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই সামরিক সহায়তার জন্য ধরনা দেন। বঙ্গবন্ধু হত্যায় সবচেয়ে লাভবান ব্যক্তি জিয়াউর রহমান যে গোড়া থেকেই হত্যা-ষড়যন্ত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, অবমুক্ত মার্কিন দলিলে তা আবারো প্রমাণিত হলো।

অবমুক্ত দলিল অনুযায়ী ২ নভেম্বর মধ্য রাতে খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সময় মোশতাকসহ ফারুক রশীদ চক্র সূর্যাস্তের আগেই পালাতে

চেয়েছিল। মোশতাক গং মার্কিন হেলিকপ্টারে চড়েই যুক্তরাষ্ট্রে পালাতে আবদার করেছিলেন। কিন্তু বিমান দিতে রাজী না হলেও খুনিদের আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করলেও সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কিসিঞ্জার খুনি মোশতাককে যুক্তরাষ্ট্রে শুধু রাজনৈতিক আশ্রয় নয়, মোশতাকের জীবন রক্ষার জন্যও সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের বোস্টারের কাছে প্রেরিত তারবার্তায় (২৬১৭৮৫) নির্দেশনা দেন– "আপনি রাষ্ট্রপতি মোশতাককে অব্যাহতভাবে এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন রয়েছে। আপনি মোশতাককে এটা জানিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি যদি আসতে চান তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বাগত জানাবে। তাকে এটাও জানাতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে, তার জীবনের নিরাপত্তাজনিত হুমকি অত্যাসন্ন, তাহলে অস্থায়ীভাবে দূতাবাসে আশ্রয় দিতে আমরা প্রস্তুত থাকবো।" *(দৈনিক প্রথম আলো, ১৩.৮.০৯)।* অবশ্য শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানকারীদের সাথে আলোচনায় সমঝোতা হওয়ায় ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় মোশতাক ছাড়া ১৫ আগস্টের অন্য খুনিরা ঢাকা ত্যাগ করে থাইল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বোস্টার কিসিঞ্জারের বার্তা ৫ নভেম্বরই পৌঁছে দেন। তিনি লিখেছেন, "আমি বেলা দেড়টায় রাষ্ট্রপতিকে ফোন করি। কিন্তু ফোন ধরেন চাষী। বলেন, রাষ্ট্রপতি এখন ফোন ধরতে অপারগ।" তবে লক্ষণীয়, ফারুক-রশীদ গং চলে যাওয়ার পরও বোস্টার চাষীকে বলেন, 'বাংলাদেশ ত্যাগের আগে দরকার হলে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সহযোগীরা দূতাবাসে থাকবেন। চাষী তাকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।'

৬ নভেম্বর বিচারপতি সায়েম নয়া রাষ্ট্রপতি হন। মোশতাক ও তার সঙ্গীরা বঙ্গভবন ছেড়ে যার যার বাসভবনে চলে যান। খুনি চক্র ২৪ নভেম্বর থাইল্যান্ড থেকে লিবিয়া রওয়ানা হয়। লিবিয়া রওয়ানা হওয়ার চারদিন আগে ঘাতক সর্দার মেজর ফারুক থাইল্যান্ডে মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলরের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে। মার্কিন অবমুক্ত দলিলের শেষ পর্বে বলা হয়, 'এই প্রথম স্পষ্ট জানা গেল, কৌশলগত কারণে ফারুক-রশীদকে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়নি। তবে তারা ভেঙে যাওয়া পাকিস্তান একত্র করতে কাজ করেছিল।' (দৈনিক প্রথম আলো, ১৮.৮.০৯)। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই মুজিব হত্যার ৮১ দিনের মাথায় '৭৫-এর ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আগস্ট চক্রান্তের প্রধান হোতা সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। এরপর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে '৮১ সালের ৩০ মে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে 'মিনি পাকিস্তান' বানানোর লক্ষ্য নিয়েই ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবকে হত্যা

করা হয়। কিসিঞ্জার-ভুট্টো-সৌদি-চীন চক্র স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি।

ড. কিসিঞ্জারের প্রাক্তন স্টাফ এসিসট্যান্ট রজার মরিস এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের প্রতি কিসিঞ্জারের তীব্র ঘৃণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, "কিসিঞ্জারের বিদেশী শত্রুর তালিকায় তিনজন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছেন আলেন্দে, থিউ ও মুজিব।" মরিস বলেন, "মুজিব ক্ষমতায় আসেন সবকিছু অগ্রাহ্য করে। আমেরিকা ও তার অনুগ্রহভাজন পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে পরাজিত করে এবং মুজিবের বিজয় ছিল আমেরিকার শাসকবর্গের পক্ষে অত্যন্ত বিব্রতকর।" (দি আনফিনিসড রেভলিউশন, লরেন্স লিফসুলটজ, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮)। সর্বশেষ মার্কিন অবমুক্ত দলিলেও প্রমাণিত হলো পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কারণেই শেখ মুজিব ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আর এই হত্যা-ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হচ্ছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার। পাকিস্তানের ভুট্টো এই হত্যা-ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন। বাংলাদেশের মোশতাক, জিয়া, চাষী, ফারুক-রশীদ চক্র ড. কিসিঞ্জারের এদেশীয় চর হিসেবে মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করেছে।

মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রে অবদান রাখার পুরস্কার হিসেবেই জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে জিয়ার শেষ পরিণতি শুভ হয়নি। ৩০ মে ১৯৮১, চট্টগ্রামে একদল সেনা সদস্য জে. জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মুজিব হত্যার পর উল্লসিত ভুট্টোকে খুনের মামলায় সেনা শাসক জিয়াউল হক '৭৯ সালের ৪ এপ্রিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। ফাঁসির পূর্বে ভুট্টোকে সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করতে হয়। নরাধম মোশতাক দুই দশক তার বাসভবনে স্বেচ্ছাবন্দী জীবনযাপন করে '৯৬ সালে মার্চ মাসে মারা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যায় ফাঁসিতে দণ্ডিত ১২ জনের মধ্যে ফারুকসহ ৬ জনের ফাঁসি ২০১০ সালে কার্যকর হয়েছে। ফাঁসিতে দণ্ডিত অপর ৫ ঘাতক বিদেশে চোর-ছেচরের মতো পলাতক জীবন যাপন করছে। মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হেনরি কিসিঞ্জার বিশ্বের লক্ষ কোটি বাঙালির কাছে একটি ঘৃণিত নাম।

মিজানুর রহমান খান ২০১৩ সালে 'মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড' নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এই বই থেকে জানা যায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই দেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরী কিসিঞ্জারের বিচারের দাবি উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাংবাদিক কিসিঞ্জারকে একজন যুদ্ধাপরাধী এবং বিচিত্র মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানিয়েছেন। 'মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড' গ্রন্থে মিজানুর রহমান খান লিখেছেন, "মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স ২০০১ সালে তার 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' বইয়ে লিফশুলজের বরাতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআইএর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সমর্থন করেন। হিচেন্স চার দশকের বেশি সময় সাংবাদিকতা ও লেখালেখিতে জড়িত ছিলেন। নিউ স্টেটম্যান, দি আটলান্টিক,

দ্য নেশন, দ্য ডেইলি মিরর ও ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। তিনি ১২টি বই লিখেছেন। তিনি ক্যান্সারে মারা গেলে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারসহ অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' বইয়ে লেখক হিচেন্স কিসিঞ্জারকে একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিসিঞ্জারের বিচারের জন্য ন্যুরেমবার্গসহ অন্য কিছু ট্রাইব্যুনালের আদলে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের দাবিও তোলেন তিনি। কিসিঞ্জারকে তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এক বিচিত্র মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। হিচেন্স লিখেছেন : "বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কিসিঞ্জার রাজনীতির বিষয়টাকে একটি নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার হিসেবে গ্রহণের প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁর কারণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তাঁর জন্য অসুবিধাজনক কতিপয় ব্যক্তির কথাও আমরা জানি। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সালভাদর আয়েন্দে, আর্চ বিশপ ম্যাকারিওস ও শেখ মুজিবুর রহমান।" (পৃষ্ঠা ২০-২১) দুনিয়ার আদালতে কিসিঞ্জারের বিচার হয়তো হবে না। কিন্তু ইতিহাস তাকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারীদের বিচারও মানুষের আদালতে হয়নি। কিন্তু প্রকৃতির আদালতে তাদের বিচার ঠিকই হয়েছিল। মোহাম্মদী বেগ ঘাতকের হাতে, মীরণ বজ্রপাতে এবং মীরজাফর কুষ্ঠরোগে মারা গেছে। রবার্ট ক্লাইভ চুরি, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আত্মহত্যা করে। জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফসহ ৯ জনকে মীর কাশিম পাটনায় নৌকাডুবি ঘটিয়ে হত্যা করেন। পাগল হয়ে রাস্তায় মারা যায় উর্মিচাঁদ। তবে এই বিশ্বে যেখানে যত বাঙালি সন্তান আছেন, তারা সবাই জাতির জনকের হত্যাকারী কিসিঞ্জারকে ঘৃণা করেন এবং বাঙালি জাতি এই ধরায় যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তারা কিসিঞ্জারকে ঘৃণা করবে। এদিকে যতই দিন যাচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম ততই আলোকিত ও উজ্জ্বল হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি পরিপূর্ণ হয় না। তাই ড. আতিউর রহমানের ভাষায়– 'বাংলাদেশের আরেক নাম–শেখ মুজিবুর রহমান'। ওপার বাংলার কবি অন্নদা শংকর রায় যথার্থই লিখেছেন–

'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরি যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'♦

*মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক এবং সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা

মহান নেতার মহত্তম স্বপ্নগুলো

মুস্তাফা মাসুদ*

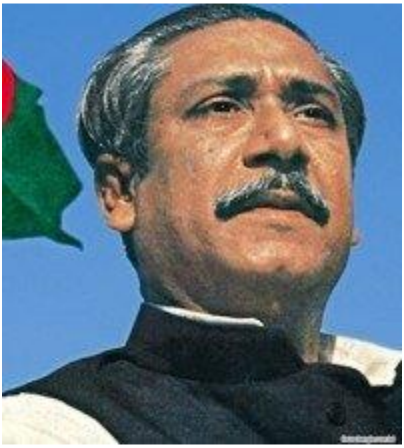

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এমনই এক জনদরদি ব্যতিক্রমী নেতা, যার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা এ দেশের শোষিত-বঞ্চিত-দুঃখী মানুষের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-চাওয়াপাওয়ার সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। একারণে বঙ্গবন্ধুর জীবনটাই হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের স্বচ্ছ-সুবর্ণ এক দর্পণ– তাঁকে দেখলেই পুরো বাংলাদেশকে দেখা হয়ে যেত; তাঁর প্রশস্ত ললাট, প্রত্যয়ী দুটো চোখ আর ভেতরের নিখাদ দেশপ্রেমের উদ্ভাস ছিল বাঙালির পরম ভালোবাসা ও ভরসার প্রতীক। তিনি সারাজীবন এ দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে ছিলেন আপসহীন, নির্ভয় সংগ্রামী; যার উন্মেষ ঘটেছিল তাঁর ছেলেবেলাতেই। গরিব ছাত্রকে নিজের বইখাতা দিয়ে দেওয়া, বৃষ্টিভেজা গরিব কিশোরকে নিজের ছাতাটি অবলীলায় দান করা, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে-থাকা বৃদ্ধ ভিখিরিকে নিজের গায়ের চাদরটা খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের গরিব-দুঃখী মানুষদের জন্য নিজেদের ধানের গোলা খুলে দিয়ে ধান বিতরণ– এসব কিংবদন্তিতুল্য সত্য ঘটনা যাঁর ছেলেবেলায় ঘটেছিল সেই মানবদরদি মুজিব যে বড়ো হয়ে সাধারণ খেটেখাওয়া, শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে তাঁর সবটুকু ঢেলে দেবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এজন্যই দীর্ঘ চব্বিশটি বছর তিনি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন; জীবনের স্বর্ণ-সময়ের

মূল্যবান তেরোটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন কারাগারে। কোনো প্রলোভন বা ব্যক্তিস্বার্থের বেপথু হাতছানি কখনো তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর এই অনমনীয় দৃঢ়তা, সাহস আর দেশপ্রেম ক্রমে ক্রমে তাঁকে বাঙালির একক কণ্ঠস্বরে পরিণত করে। ঊনসত্তরের মহাগণঅভ্যুত্থান, সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধুর দলের নিরঙ্কুশ জয়, একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন, সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু– বাঙালির ইতিহাসের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন একক বিকল্পহীন ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তব্যই ছিল গোটা বাঙালি জাতির মনের কথা; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশিত উচ্চারণ।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি আরও নতুন নতুন বৈচিত্র্য ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। এ দেশের অবহেলিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর যে-স্বপ্ন তিনি এতকাল লালন করে আসছিলেন, তা বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ সুযোগ আসে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর; এবং সেই লক্ষ্যেই তিনি ক্লান্তিহীনভাবে দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের উপযোগী একটি সংবিধান প্রণয়নসহ মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তিনি জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজটি সহজ ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামো ভগ্ন-ছিন্ন। রাস্তাঘাট-পুলকালভার্ট তছনছ। বিদ্যুৎ-জ্বালানির সংকট। দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি প্রকট–বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে। এরই মধ্যে একশ্রেণির স্বার্থলোভীর অনৈতিক পথে ধনী হওয়ার অপচেষ্টা, মজুতদারির তীব্র লালসা, চোরাকারবারি, দুর্নীতির কালোথাবা ইত্যাদি নষ্টশক্তি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নের চোরাগলিতে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টায় যেন একসাথে উঠেপড়ে লাগে। এতদসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু হতোদ্যম হলেন না। গরিব-দুঃখী, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের লক্ষ্যে সারাজীবন যে মধুর স্বপ্ন তিনি লালন করে এসেছেন বুকের গভীরে; রাজনীতির কণ্টকময় পথে অব্যাহত রেখেছেন তাঁর বিরামহীন অভিযাত্রা, সেই 'সোনার বাংলা' গড়ার সংকল্প তিনি ত্যাগ করবেন কীভাবে?

কিন্তু, 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে এলো চুয়াত্তরের ভয়াবহ অকাল বন্যাসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। দেশে দেখা দিল দারুণ খাদ্যাভাব। জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার নানা তালবাহানায় বাংলাদেশকে টাকার বিনিময়েও খাদ্য দিল না। তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি, সমর্থন করেছিল হানাদার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে। এবার তারা সুযোগ পেয়ে বাঙালির ওপর শোধ তুলল খাদ্য না দিয়ে; মানুষকে দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুর শিকার বানিয়ে।

একাত্তরের পরাজিত শত্রুরাও দেশের ভেতরে ও বাইরে বসে নানা ষড়যন্ত্রের খেলা অব্যাহত রেখেছে বেশ আগে থেকেই– তারা মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে নানান চক্রান্ত করতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে পরিকল্পিতভাকে শুরু করা হয় নানা অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে চালানো হয় বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য। এসব মহলের কারসাজিতে দেশে হত্যা-রাহাজানি-ডাকাতি বেড়ে গেল। নানাক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ঘুষ-দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠতে লাগল। এমন পরিস্থিতি কঠোর হস্তে সামাল দেওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধুর হাতে আর কোনো বিকল্প রইল না। তিনি প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে তাঁর স্বপ্নের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এভাবে: ‘‘আজ শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ...আজ দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কালোবাজারী, নতুন পয়সাওয়ালা এদের কাছে আমার আত্মবিক্রি করতে হবে, এদের অধিকারের নামে আমাদের এদেরকে ফ্রি-স্টাইল ছেড়ে দিতে হবে? কক্ষনো না।.. যারা আজকে আমার মাল বিদেশে চালান দেয়, চোরাকারবারী করে, যারা দুর্নীতি করে, এদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।’’ (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫: জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণ) । সংসদের এই অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র-পরিচালনায় এমন এক ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন, যা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ‘সোনার বাংলা’ গঠনে দ্রুত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ঐ নতুন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন: ‘‘আজ আমি বলতে চাই–This is our second revolution, second revolution আমাদের। এই revolution-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।.. যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি, এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই।’’ এ লক্ষ্যে ঐদিনই সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক বহুদলের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় দল– ‘বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কী ছিল ওই নতুন ব্যবস্থার বিস্তারিত কর্মসূচি? বলা যায়, প্রচলিত অর্থে তা কাগজেকলমে লিপিবদ্ধ কর্মসূচি হলেও আদতে তা ছিল এক মহান নেতার মহত্তম সুবর্ণ স্বপ্নগুচ্ছ; যার সাথে কোটি মানুষের নাড়ির যোগ ছিল, তাদের বাঁচামরার প্রশ্ন জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধুর সেই কর্মসূচি বা মহত্তম স্বপ্নগুচ্ছ ছিল তাঁর বিশ্বাস আর জীবনদর্শনেরই অংশ। বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ গড়ার মূলসূত্র বা লক্ষ্যগুলো ছিল: দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, কারখানায়, খেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি, পপুলেশন

কন্ট্রোল বা ফ্যামিলি প্ল্যনিং; জাতীয় ঐক্য, গণমুখী প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, গণমুখী বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন, শিক্ষার প্রসার, সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, পরনির্ভরশীলতা বর্জন ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এবং আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান বাধা। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে কঠোর হস্তে দুর্নীতির মূল উৎপাটনের কোনো বিকল্প নেই বলে বঙ্গবন্ধু এই ক্ষেত্রটিকে গুরুত্বের সাথে চিহ্নিত করেন এবং ''দুর্নীতিবাজ খতম কর'' বলে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন।

গণমুখী প্রশাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে সাধারণ মানুষের সেবা ও কল্যাণে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়: ''এই ঘুণে ধরা ইংরেজ আমলের, পাকিস্তান আমলের যে শাসন ব্যবস্থা তা চলতে পারে না। একে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।''

শত শত বছর ধরে নানা অবিচার আর জুলুমের শিকার জনগণের জন্য সহজে এবং দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি বিকেন্দ্রীকৃত গণমুখী বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে অন্যায়-অপরাধসহ নানামুখী বিশৃঙ্খলা কঠোরহস্তে দমন করা যায় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। বিচার পেতে গিয়ে যাতে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে না হয়; বিচার পাওয়ার আশায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে না হয়। এ প্রসংগে বঙ্গবন্ধু বলেন: 'বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার।.. এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে, থানায় ট্রাইব্যুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে– তার বন্দোবস্ত করছি।''

কলকারখানা ও খেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণও ছিল অত্যন্ত সময়-উপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। দেশকে খাদ্য এবং শিল্পদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে না পারলে জাতির পরনির্ভরতা দূর হবে না– সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। বাংলাদেশ মূলতই কৃষিপ্রধান দেশ বলে তিনি কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমি রাখার বিধান করলেন এবং সমবায়ের ভিত্তিতে সমস্ত কৃষিজমি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই ব্যবস্থায় কৃষকের জমির মালিকানা হাতছাড়া হবে না; অথচ সরকারি সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুপরিকল্পিত সমবায় পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন: ''গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ

বছরের প্ল্যান– এই বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে।.. প্রত্যকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।”

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় ঐক্যের প্রসার বঙ্গবন্ধুর সময়ে যেমন, এখনও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। অধিক জনসংখ্যা জাতীয় উন্নয়নকে যে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করে, তা বুঝতে ভুল করেননি বঙ্গবন্ধু। তাই অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের প্রসারকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছিলেন এবং এটিকে ‘চার নম্বর’ কর্মসূচি হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাজনৈতিক হানাহানি, দলীয় কোন্দল এবং সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু-গৃহীত ‘জাতীয় ঐক্যের প্রসার’-এর উদ্যোগকে বড়ো বেশি প্রাসঙ্গিক আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

উল্লিখিত স্বপ্নগুচ্ছ বাস্তবে রূপ গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর আজীবনের স্বপ্ন শোষিতের গণতন্ত্র তথা ‘দুঃখী মানুষের মুখে হাসি’ ফুটিয়ে ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রস্তুতি-পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঐ বছরের (১৯৭৫) ১ সেপ্টেম্বর থেকেই বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ-এর ছত্রছায়ায় ‘সোনার বাংলা’ গড়ার সুবর্ণ স্বপ্নগুচ্ছ সরকারিভাবে বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ বঙ্গবন্ধু আর পেলেন না। তার আগেই পনেরোই আগস্টের কালরাতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তে খুনিচক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন; তা না হলে বহু আগেই বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা ও খাদ্য উৎপাদনসহ আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হতো– এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি– তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর কাছে সমগ্র জাতির প্রত্যাশা: তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে অচিরেই বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে; আর বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’র সুবর্ণ স্বপ্নগুচ্ছ সুখ আর সমৃদ্ধির জোছনা হয়ে হাসি ছড়াবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সুরমা থেকে কপোতাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত পল্লভূমিতে, যার নাম বাংলাদেশ।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ–মুজিববর্ষ পালিত হচ্ছে জাতীয়ভাবে, ১৭ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। জন্মশতবর্ষে আমরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।♦

জয় বাংলার ইতিবৃত্ত এবং বঙ্গবন্ধু

খালেক বিন জয়েনউদদীন*

আমাদের সোচ্চার কণ্ঠ, যে মহামানুষটির আজীবন সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশ, তাঁকে '৭৫-এ একদল নরঘাতকের হাতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তের কারণে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হয়। নরপিচাশী দলের হোতারা অবৈধভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সেই মহামানুষ বঙ্গবন্ধুকে, বাংলাদেশ একাত্তরের চেতনাকে এবং স্বাধীনতাকামী দেশ প্রেমিকের বিনাশ করে। কিন্তু ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারায় বঙ্গবন্ধু মাত্র একুশ বছরের মধ্যে ফিরে আসেন জ্যোতির্ময় নক্ষত্র রূপে। ঘাতকেরা গলায় রশি পরেছে, কেউ কেউ মরেছে, কেউ আবার নাগিনী অন্ধকারে পালিয়েছে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্ম নেয়া বাঙালি স্ব-শাসনের রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালন করছি। ২০২০-এর মার্চ থেকে ২১-এর মার্চের মধ্যে। এই সময়টুকু আমরা নাম দিয়েছি মুজিববর্ষ। আমাদের জীবদ্দশায় তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। দেশকে পাকি ও দেশীয় বিভীষণমুক্ত করেছি। একাত্তরে বাঙালির মহাবিজয় ঘটলেও একাত্তরের শত্রুরা সমূলে বিনাশ হয়নি।

কিন্তু আমাদের ভয় নেই। আমাদের আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার চেতনার ধ্বনিমন্ত্র জয় বাংলা। যে ধ্বনি আমরা একাত্তরের বুক ধারণ করে যুদ্ধ করেছি, শত্রুদের হটিয়েছি। একাত্তরের সেই ধ্বনি শুনে পাকি সৈন্যরা ঢাল-সড়কি

ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে। এই ধ্বনি বাংলার সাধারণ মানুষের, এই ধ্বনি শেখ মুজিবের, নজরুলের।

জয় বাংলা শব্দধ্বনির অর্থ বাংলার জয়, আর বাংলা মানে বাংলাদেশ তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিজয়। এই ধ্বনির প্রবর্তক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও উদ্ভাবক কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তার কাব্যগ্রন্থ ভাঙার গানে মাদারীপুরের মর্দবীর বিপ্লবী পূর্ণ চন্দ্র দাসকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতা লিখেন। এই কবিতাটিতে কবি প্রথম এই শব্দধ্বনি ব্যবহার করেন এভাবে :

জয়বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয়বাংলা আদি অন্তরীণ,
জয় যুগে যুগে আসা সেনাপতি, জয়প্রাণ আদি অন্তহীন।

এই পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন শান্তিসেনা বাহিনীর প্রধান। তার কারামুক্তি উপলক্ষে নজরুল কবিতাটি লেখেন এবং প্রথম জয় বাংলা শব্দধ্বনি ব্যবহার করেন। তার সরাসরি বাঙালির জয়ের কথা বলেন 'বাঙালির বাঙালা' প্রবন্ধটিতে। সেখানেও জয়বাংলা প্রতিধ্বনি। কবি লেখেন বাঙালিকে, ছেলেমেয়েকে, ছেলেমেয়েকে ছোটবেলা থেকে শুধু এই একমন্ত্র শোখানো হোক :

এই পবিত্র বাঙলা দেশ
বাঙালির আমাদের
দিয়া প্রহারেন ধনঞ্জয়
তাড়াবো আমরা, করি না ভয়
পরদেশি দস্যু ডাকাত-

বাঙালা বাঙালির হোক। বাঙালা জয় হোক, বাঙালির জয় হোক। নজরুলের এসব ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল বঙ্গবন্ধুকে দারুণভাবে। মাদারীপুর থাকতে বঙ্গবন্ধু শান্তিসেনাদের সভায় যেতেন। শান্তিসেনারা ছিলেন সুভাস বসুর অনুসারী। পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে ঐ জয় বাংলা ধ্বনির কবিতা তাকে সাহস যুগিয়েছিল। তিনি নজরুলের মন্ত্রকে বাঙালির ছেলেমেয়েদের শেখানো এবং জাগানোর লক্ষ্যেই জয় বাংলা শব্দধ্বনি প্রবর্তন করেন এবং ব্যবহার শুরু করেন আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকের পর থেকে সকল ভাষণে, সকল বাণী ও রচনায়। বন্দে মাতরম, জয়হিন্দ ও জিন্দাবাদের সঙ্গে জয় বাংলার অনেক পার্থক্য। বাংলা বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি নিজস্ব ধ্বনি বা শব্দগুচ্ছ। একাত্তরে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি। এ সময়ই এই শব্দধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। একসময় বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলা হতো জয় বাংলার দেশ। জয় বাংলার দেশ মানে একাত্তরের যুদ্ধের বাংলা। শেখ মুজিবের বাংলা, মুক্তিযুদ্ধের বাংলা।

একাত্তরে কলকাতা গেছি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। আইএ ক্লাসের ছাত্র। ঢাকায় পড়াশোনা করতাম। ছাব্বিশ মার্চের পরে পায়ে হেঁটে গোপালগঞ্জ। ক'দিন

থেকে ৫ ভাই গেলাম ৮দিন হেঁটে বেনাপোল, বনগাঁ এবং কলমবন্ধু প.বঙ্গের নৈহাটি কাচড়া পাড়ার বিপ্লব সেনগুপ্তদের বাসায়। সেখান থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোঁজা এবং প্রশিক্ষণ নেবার জন্য শরণার্থী ক্যাম্পের লাইনে দাঁড়ানো। একপর্যায়ে সন্ধান পেলাম বালুহাক্কাকে লেনে জয় বাংলা অফিস। সেখানে গিয়ে দেখি বাংলাদেশের লোকজন।

সাক্ষাত পেলাম গোবিন্দ হালদারের ও তখনকার প্রখ্যাত গল্পকার অনু ইসলামের। অনু ইসলাম খুবই পরিচিত। তিনি ঐ অফিসে থাকতেন। তার মূল চাকরি স্বাধীন বাংলার সম্পাদনায়। একাত্তরের এই স্মৃতিতর্পণ এখন করছি তখন করছি এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার পরে আমাদের আইডি হয় জয়বাংলা। বাস, গাড়ি, ট্রাক, ট্রাকে করে চড়েছি, তখন বলেছি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি। এসব যানবাহনের টিকিট চেকাররা বলেছেন-ও জয়বাংলার লোক। ঠিক আছে, কোন ভাড়াই লাগবে না। ভাড়া লাগেনি সেই একাত্তরের কলকাতায় যানবাহনে জয় বাংলার মানুষ বলে।

একাত্তরে স্বাধীনবাংলা বেতারে প্রচারিত এবং তখনকার সকল অনুষ্ঠানে গীত গাজী মাজহারুল আনোয়ারের, জয় বাংলা জয়, জয় বাংলা জয় একটি সর্বজনীন সঙ্গীত।

জয় বাংলা বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল সত্তা হলেও এ শব্দ ধ্বনির শত্রুর অভাব নেই। যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী নয়, কিংবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতে নারাজ, তারা জয় বাংলাকে প্রচণ্ডভাবে ভয় পায়। বাংলার জয় তাদের গাত্রদাহ করে। ঐ যে পঁচাত্তরের পরে বঙ্গবন্ধুর খুনি, পরামর্শক ও মদদদাতারা ক্ষমতায় বসে জয় বাংলার পরিবর্তে পাকি ধুয়া, জিন্দাবাদ বলতে শুরু করে একুশ বছর চলে ঐসব স্বাধীনতাবিরোধীদের অপকর্ম ও পাকি প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। কিন্তু আমরা কী দেখলাম! সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস তার আপন গতিতে লেখা হয়। সত্যকে ধামাচাপা দেয়া যায় ক্ষণিক, কিন্তু সত্যের নূর এতই উজ্জ্বল যে, অন্ধকারের বুক চিরে আলোকিত করে ভুবনকে। যারা ইতিহাসকে পদদলিত করে, তারাই দলিত হয়ে কালের বিবর্তনে। জয় বাংলা সামান্য দুটি শব্দের মিশ্রণে গঠিত। যার উৎস বাঙলা, বঙ্গ কিংবা বাংলা এবং এই জনপদের জনগোষ্ঠী বাঙালি নামের এক মানবগোষ্ঠী। যার ইতিহাস চিরায়ত, তা কখনো মুছে ফেলা যায় না। যার শক্তি অসীম, তা কখনো ঐশীও।

বাঙালি, বঙ্গ কিংবা বাংলাদেশ সেই আদিকাল থেকেই স্বাধীন হলেও শাসনকর্তারা ছিল অবাঙালি। দুই হাজার বছর পরে মুজিবই স্বরাজ এনে দিলেন জয় বাংলা ধ্বনি তুলে। তিনি বাঙালিকে শাসন ক্ষমতায় বসালেন। যা দুই হাজার বছরে সম্ভব হয়নি। অথচ এই স্বরাজের জন্য বাঙালির কোটি প্রাণ দিতে হয়েছে বলি। অবশেষে মানুষের সংগ্রামের ও আন্দোলনের বাঙালির সর্বশেষ বিজয়।

একাত্তরে আমরা ছিলাম জয় বাংলার সন্তান। মুজিব ছিলেন জয় বাংলা প্রবর্তক। এই জয় বাংলা শুধু ধ্বনি নয়, বাংলাদেশের পরিচয় বহনকারী অনিবার্য শব্দগুচ্ছ। যা আজো বাঙালিকে শনাক্ত করতে পারে উচ্চারণের সাথে সাথে। এই শব্দধ্বনি সমগ্র বাঙালির এবং শেখ মুজিবের। শেখ মুজিব যেমন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তেমনি জয় বাংলাও শেখ মুজিবের অন্তর আত্মার প্রতিধ্বিনি। এই ধ্বনি বাঙালির অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে মুজিবের জয়ধ্বনি প্রবাহ, যা চিরকাল বাঙালি হৃদয় নদীতে বহমান।

শেখ মুজিব জয় বাংলার প্রতিষ্ঠাতা। জয় বাংলা মানেই বাংলাদেশের বিজয়। আর বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিব। সেখানে একই সরণিতে জয় বাংলা, বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব। এই তিনটি শব্দগুচ্ছের একটি ঝরে পড়লে গাছটির অঙ্গহানি হবে। তাই এই গাছটিকে শক্ত-সবল রাখার জন্য আমাদের সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে, স্বাধীনতাবিরোধী কাপালিক ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার জন্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য একাত্তরে মুজিব নগর সরকার জয়বাংলা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলো ১৭ই মে, ৭১। এটি এমএনএন আবদুল মান্নানের তত্ত্বাবধানে আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদনায় কলকাতার ২২/২ বালুহাক্কার লেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন অনু ইসলাম নজরুল ইসলাম, শব্দসৈনিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যা আগেই বলেছি।

জয়বাংলা নামে ৩০ মে মার্চ বাংলাদেশের নওগাঁ থেকে রহমতুল্লাহ (ছদ্মনাম) প্রকৃত নাম এম গুল হায়দারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিলো দৈনিক। ১১দিন পর পাকিদের ভয়ে আর প্রকাশিত হয়নি।

আমরা গত ৪৮ বছর ধরে জয় বাংলা ধ্বনিকে জাতীয় ধ্বনি ঘোষণা করার জন্য আবদার অনুরোধ করছি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার আদৌ সেদিকে নজর দেননি। পঁচাত্তরের পর স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের হোতা খোনকার ও জিয়া এই ধ্বনি মুছে ফেলার জন্য পাকিস্তান জিন্দাবাদ পুনঃপ্রচার শুরু করে। সম্প্রতি আমাদের বিচার বিভাগ এই জয় বাংলা ধ্বনিকে জাতীয়ভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করেছে। এটা একাত্তরের বিজয়, মুজিবের বিজয়, নজরুলের বিজয়।

আমার আবারো প্রস্তাব করছি এই জয়বাংলা ধ্বনি নামে আমাদের বাংলাদেশ বেতারের একটি তরঙ্গের নামকরণ করা হোক। যেমন আকাশবাণী

কলকাতা কেন্দ্রের দুটি তরঙ্গের নামকরণ করা হয়েছে। মৈত্রী ও গীতাঞ্জলী নামে। আমাদের তরঙ্গের নাম হতে পারে এরকম- একাত্তর।

জয়বাংলা আমাদের একাত্তরের যুদ্ধে বিজয়ী করেছে। আমাদের সাহস যুগিয়েছে। বিপদে, আপদে ও সংকটে এই শব্দধ্বনি শক্তি সাহসের উৎস। বাঙালি সংগ্রামও স্বাধীনতার উৎস। যার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক বাংলার দুই বিদ্রোহী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম।

দেরিতে হলেও উচ্চ আদালতের নির্দেশ বাঙালির প্রাণের আশার সঞ্চার করেছে। আমরা আশা করবো বর্তমান জাতীয় সংসদ জয়বাংলা ধ্বনিকে আমাদের পবিত্র সংবিধানে প্রতিস্থাপন করে এই রায়ের প্রতি সম্মান দেখাবেন বাঙালির জয়-বিজয়কে চিরস্থায়ী রূপ দেবেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে আমরা হারিয়েছি জয়বাংলার প্রবর্তক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবার পরিজন ও নিকট স্বজনদের। এ বছরের জাতীয় শোক দিবসের দিনটি অতীব তাৎপর্যবহ। এ বছরের মার্চ থেকে একুশের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত আমরা মুজিববর্ষ পালন করছি। বৈরি পরিবেশ হলেও শেখ মুজিব আমাদের হৃদয়ে। শত বছরের আলোয় আজো তিনি নক্ষত্ররাজ। তার আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম বাঙালির ইতিহাস অমলিন হয়ে থাকবে। তার আদর্শ আমাদের চিরকাল পথ দেখাবে জয়বাংলা ধ্বনির মতো।♦

জাতির পিতার জীবনকথা
প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন*

বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি মায়ের মতোই প্রিয়। বুক-ভরা মমতা আর ভালোবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন। কবি তাইতো বলেছেন:

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলো চির-নিবেদিত। গোপালগঞ্জের বাইগার নদী-বিধৌত ছোট্ট গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারের আদরের **'খোকা'** ধাপে ধাপে উঠে এসেছিলেন জনগণের ভালোবাসার উত্তুঙ্গ শিখরে। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁর উপাধি দিয়েছে **'বঙ্গবন্ধু'**। নন্দিত হয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি হিসেবে, জাতির জনক হিসেবে। তিনি বাঙালির আত্মার আত্মীয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি সর্বদাই মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন এবং তাঁর উপায় নিয়ে লিখতেন। তিনি ভাষণের মাধ্যমে জাতিকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। এত বড় দার্শনিক, রাজনৈতিক নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিশ্ব শান্তির বাণী নিয়ে তিনি জয় করতে চেয়েছেন সারাবিশ্ব। তিনি ছিলেন এদেশের জনতার নয়নের মনি, গৌরবের ধন।

যে জাতি তাঁর কৃতি সন্তানদেরকে সম্মান করতে জানেনা সে জাতি বিশ্বে কখনো বড় হতে পারে না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫খ্রি:) 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি': বিবিসির জরীপে এটি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি শুধু নয়, মহাকালের অভিধায় তুলনাহীন। বাঙালি জাতি-স্বত্তা বিনির্মাণে, অধিকার আদায়ে, জাতি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারায় তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, উজ্জীবিত করেছে, স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জাতিকে তৈরি করেছেন সার্বিকভাবে।

আমাদের হিমাদ্রিস্পর্শী গর্ব, আমাদের প্রোজ্জ্বল অহংকারের স্বর্ণালি ধারাপাত। বাঙালির সর্বকালের ইতিহাসে তিনিই সেই স্বপ্নের মহান রাজপুত্র, যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ উপহার দিয়েছেন; যিনি আমাদেরকে দিয়েছেন স্বতন্ত্র পতাকা, স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় এবং এক-সমুদ্র সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের অকুতোভয় বর্ণিল মহিমা।

স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু দেশী-বিদেশী লেখক তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখেছেন। তবে এই স্বাধীন বাংলার অধিবাসীরা তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো নিয়ে তেমন কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করেনি। যার ফলে ব্যাপক মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী বিশেষ করে যারা ১৯৭০ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরোধিতা করেছিল। তারা বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর ভাবমুর্তিকে ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন অপরিহার্য।

বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীন বাংলাদেশ একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাসের অনেক উত্থান পতনের পথ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই অঞ্চলকে ঘিরে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখানকার মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কারণে এবং সাম্প্রদায়িকতার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় এক নতুন ঔপনিবেশিক যুগের পোড়াপত্তন ঘটে। বস্তুত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো কিম্বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি শুরুতেই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক মারাত্মক স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়। উপরন্তু মুসলিম লীগ শাসকরা ভারত বিরোধিতা ও ধর্মের দোহাই তুলে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর আঘাত করতে থাকে। এই পটভূমিতে শুরু হয় বাঙালির ভাষা আন্দোলন। আর এই ভাষা আন্দোলন থেকে উন্মেষ ঘটে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। এভাবে সূচিত হয় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পালা। বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ এবং বাঙালির অবিসংবাদিত জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে।

অহিংসা, মানবপ্রেম আর ভালোবাসা দিয়ে বাংলার মানুষের মধ্যে তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তার কোন ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই।

শান্তির জন্য অহিংসা, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম অপরিহার্য। যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সবই বিরাজমান ছিল। বঙ্গবন্ধু অহিংসা, দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম দিয়েই মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ নয়- শান্তি, বিভেদ নয়- ঐক্যই হওয়া উচিত বর্তমান বিশ্বের আপামর মানুষের পরম কাম্য।

সত্যিকারের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা গড়েছি বর্তমান, আর স্বপ্ন দেখি সুন্দর ভবিষ্যতের।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২০ চৈত্র, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ, মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়রা বেগম। শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবন্ধুর চারবোন ও এক ভাই।

বঙ্গবন্ধুর বাবা ও মা তাঁকে ছোটবেলায় আদর করে 'খোকা' বলে ডাকতেন। তখন কে জানত তাঁদের এই সোনামানিক 'খোকা' একদিন বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিব হবেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হবেন। বঙ্গবন্ধুর পিতামাতা জীবদ্দশায় তাঁদের প্রিয় খোকাকে 'জাতির জনক' হিসেবে বরণ করতে দেখে গেছেন।

গ্রামবাংলার শ্যামল-সবুজ প্রান্তরে শৈশব ও কৈশোরে শেখ মুজিব খেলাধুলা করেছেন আর প্রাণভরে নির্মল আলোবাতাশ গ্রহণ করেছেন। শৈশবে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন গ্রামবাংলার মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা। গ্রামের অধিকাংশ গরিব মানুষ তিনবেলা খাবার জোগাড় করতে পারে না। বিলের শাপলা ও পথের পাশের কচুশাক খেয়ে তারা তাদের ক্ষুধা মেটায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কিশোরমনে গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষের দুঃখদুর্দশা গভীরভাবে রেখাপাত করে, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে আন্দোলিত ও প্রভাবান্বিত করেছিল।

শেখ মুজিব টুঙ্গীপাড়ার সন্নিকটে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। এখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন।

১৯৩৪ সালে পিতা শেখ লুৎফর রহমান তাঁকে তাঁর কর্মস্থল মাদারিপুরে নিয়ে যান এবং সেখানকার ইসলামিয়া হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। এখানে থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর চোখে ছানি পড়ে।

১৯৩৫ সালে শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে বদলি হলে শেখ মুজিবকে গোপলগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চোখের অসুখের জন্য বেশ কিছুদিন তাঁর পড়া বন্ধ রাখতে হয়।

১৯৩৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং তাঁর বাণিজ্য ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের আগমনে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ সংবর্ধনার আয়োজন করে। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের নিয়ে সংবর্ধনার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নেতৃবৃন্দ মিশন স্কুল পরিদর্শন করে ফেরার পথে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সামনে দাঁড়ান। স্কুলের ছাত্রাবাস সংস্কারের জন্য তিনি দাবি জানান। শেরে বাংলা তাঁর দাবি মেনে নেন।

বাংলার দুই মহান নেতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের এটাই ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাতে তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিভার পরিচয় পান। তাঁদের এ পরিচয় পরবর্তীকালে আরও ঘনিষ্ঠ হয়, বিশেষ করে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি শেখ মুজিবকে আপন করে নেন এবং তাঁকে নেতা হিসেবে গড়ে তোলেন।

১৯৩৩ সালে ১২/১৩ বছর বয়সে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর চাচাত বোন ফজিলাতুন্নেসা রেণুর বিয়ে হয়। তাঁদের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দুই কন্যা ও তিন পুত্র। তাঁদের নাম শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে থেকে কলেজ শিক্ষা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ঐ বছরই পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩ সালে শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের সংস্থা ফরিদপুর জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক ছাত্রলীগ গঠন করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী খাজা

নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে বলে ঘোষণা করলে তাৎক্ষণিকভাবে শেখ মুজিব এর প্রতিবাদ জানান।

উর্দুভাষী খাজা নাজিম উদ্দিনের বক্তব্যে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। তিনি ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শেখ মুজিবের প্রস্তাবক্রমে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলাভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিব সহকর্মীদের সঙ্গে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। তাঁর গ্রেফতারে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্রবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি ১৫ মার্চ জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রজনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সভপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে শেখ মুজিব ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেন।

১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি ইঙ্গিতে শেখ মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রনেতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করেন। তাঁর আইন পড়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ কবি শেলিকেও তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর জন্য অক্সফোর্ড থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় ‘Poet of politics’। স্বাধীন দেশে পড়াশোনা করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সুবিচার পাননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কবি শেলি একদিন অক্সফোর্ড থেকে বহিস্কৃত হলেও পরবর্তীকালে তাঁর মর্মর মূর্তি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বঙ্গবন্ধুকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ সম্মান প্রদান করেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুন মাসের শেষের দিকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। শেখ মুজিব জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন।

এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙের দায়ে তিনি গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তিলাভ করেন। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন।

১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসার পর আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করেন। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। এবার তাঁকে প্রায় দু বছর জেলে আটক রাখা হয়।

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদে বন্দি থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহবান জানান।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুরাতন কলাভবনের (এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগ) আমতলা থেকে রাজপথে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ শহিদ হন। মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার দাবি আদায় করতে গিয়ে ছাত্রদের বুকের রক্তের রাজপথ রঞ্জিত হয়। শেখ মুজিব জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় এক বিবৃতিতে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। শুধু তাই নয়, এই শোকাবহ ঘটনার পর তিনি একটানা সতের দিন অনশন করেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিপান।

১৯৫৩ সালে ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ও মাওলানা

ভাসানীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং কাউন্সিল সভায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য পূর্ব বাংলার গ্রামেগঞ্জে প্রচার অভিযান চালান।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ আসনে বিজয়ী হয়। ২১ দফার ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক বিজয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা ছিল ১৪৩টি।

শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে তের হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সালের ১৫ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক সরকারের সমবায়, কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ২১ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা নামে একটা কুখ্যাত কালো আইনে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে।

১৯৫৪ সালের ৩১ মে কেন্দ্রিয় সরকার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। শেখ মুজিবসহ শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৫ সালের ৩ জুন শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন। ৫ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকা পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৫ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।

পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব করলে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, ‘তারা পূর্ব বাংলার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান করতে চায়। আমরা বারবার দাবি করেছি যে, আপনারা এ অঞ্চলের নাম বাংলা করবেন। বাংলার নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। আপনারা জনগণকে জিজ্ঞেস না করে এ নামের পরিবর্তন করতে পারেন না। একান্তই যদি পরিবর্তন করতে চান তবে আমাদের বাংলায় ফিরে যেতে হবে এবং জিজ্ঞেস করতে হবে তারা পরিবর্তন করতে চায় কি না।’

১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি আনেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে তিনজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় সফরে চিনে যান। একই বছরে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে জাপান সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে শেখ মুজিব ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সফর করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তদনীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সরাদেশে সামরিক শাসন জারি করে জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। ইস্কান্দার মির্জা ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং জেনারেল আইয়ুব খান অন্য জেনারেলদের সহায়তায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। সারাদেশে এই সময়ে সবরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, শেখ মুজিব এবং অন্য নেতৃবর্গ সারাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ঐ বছর ১২ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পরে তাঁকে মুক্তি দিয়ে জেলগেটেই আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬১ সালের ২১ জুন হাইকোর্টের শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ৫ ঘন্টা সওয়াল-জবাব করেন। পরে তিনি মুক্তি পান।

১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন এবং ১৮ জুন মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ত্যাগ করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬৪ সালে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শেখ মুজিব দাঙ্গাপ্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং ‘পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও’ শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রচারপত্র বিলি করেন।

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় নেতৃসম্মেলনে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করেন। ১০ ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনেও তিনি ছয় দফা উত্থাপন করেন।

১৯৬৬ সালের ১৮-২০ মার্চ হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ বছর প্রথম তিনমাসে তাঁকে ৮বার গ্রেফতার করা হয়। ৮ মে নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক সমাবেশ থেকে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৮ সালে ১৮ জানুয়ারী দীর্ঘদিন কারাবাসের পর শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নম্বর আসামি হিসেবে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁর বন্দিজীবনের অবসান হয়।

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রজনতার পক্ষ থেকে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭ ডিসেম্বর সমগ্র পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চলের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয়যুক্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভূট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সদস্যগণ রেসকোর্স ময়দানে ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব শপথবাক্য পাঠ করান।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের বৈঠক হঠাৎ স্থগিত ঘোষণা করেন। দেশবাসী তৎক্ষণাৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনের পশ্চিম পাশের গেটের দোতলায় ছাদের উপরে চার ছাত্রনেতা স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ সংগ্রামী জনতার সামনে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের শেষে তিনি

সুস্পষ্ট উচ্চারণে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

২৩ মার্চ ১৯৭১। পশ্চিম পাকিস্তানে দিনটি যখন ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ হিসেবে পালিত হচ্ছিল, তখন এদেশের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ থেকে ২৪ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোসাহেবের অনেকগুলো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠক ছিল সাজানো নাটকমাত্র। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানে প্রচুর সৈন্য নিয়ে আসা হয়। ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর কথামতো বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর ‘ব্লুপ্রিন্ট’ প্রণয়ন করেন। জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনারা ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বাঙালি নিধনে মেতে উঠে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পরে বঙ্গবন্ধুকে পাকবাহিনী গ্রেপ্তার করে করাচি নিয়ে যায়। গ্রেফতার বরণের প্রাক মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বন্দিশালা থেকে মুক্তিলাভ করে ডক্টর কামালসহ পিআইএ-র বিমানে লন্ডনে উপস্থিত হন। লন্ডনে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে আলাপ করেন।

সাংবাদিকদের নিকট তিনি বন্দিজীবনের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, প্রথমে তিনি তাঁর দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাবেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি লাখ লাখ জনতার উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক বেনবেল্লা ফ্রান্স থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে আলজিয়ার্সে পৌঁছলে যেভাবে সংবর্ধনা দিয়ে তাঁর দেশের মানুষ বরণ করে নিয়েছিল, ঐদিন বঙ্গবন্ধুকেও তেমনিভাবে বাংলাদেশের মানুষ বরণ করে নেয়।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি ভারত সফরে যান। কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসীর অবদানের প্রশংসা করেন। ১৯৭২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজিয়ার্স গমন করেন।

১৯৭২ সালে ১০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক লাভ করেন।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু দেশের সংবিধানে স্বাক্ষরদান করেন।

১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

১৯৭৩ সালে ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করেন।

১৯৭৩ সালে ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু জাতীয় দল বাকশাল গঠনের ঘোষণা প্রদান করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের কালোরাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক পথভ্রষ্ট সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে প্রাণ হারান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর পিতামাতার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।♦

*সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

ইসলামের খেদমতে শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, একটি নতুন মানচিত্রের অমর রূপকার। বড় বিচিত্র, বর্ণাঢ্য আর কীর্তিতে ভরা তাঁর জীবন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার চেতনার অধিকারী একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি কখনও ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। বাংলাদেশকে সকল ধর্মের সকল মানুষের জন্য শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। বঙ্গবন্ধুর স্বল্পকালীন শাসনামলে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণার্থে গৃহীত ইসলামের খেদমতে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌত অবকাঠামোগত পদক্ষেপ যেমন ছিল, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গ্রহণ করেছিলেন বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকরী নানা ব্যবস্থা। তিনি যেমন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মহান স্থপতি, তেমনি বাংলাদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের খেদমত, প্রচার-প্রসারের স্থপতিও তিনি। এ দুটি অনন্য সাধারণ অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধুর জীবনকে দান করেছে প্রোজ্জ্বল মহিমা। তবে ইসলামের খেদমত, প্রচার-প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদানের বিষয়টি আমরা অনেকে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল নই। অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধী-স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মতলববাজরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলকে সর্বদা ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে চালায় নানা রকম ভিত্তিহীন অপপ্রচার।

ইসলাম প্রচার-প্রসার ও খেদমতে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর সপ্তম পূর্বপুরুষের বঙ্গে আগমন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল। (শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফুর রহমান, পিতা শেখ আবদুল হামিদ, পিতা শেখ তাজ মাহমুদ, পিতা শেখ মাহমুদ

ওরফে তেকড়ী শেখ, পিতা শেখ জহির উদ্দিন, পিতা দরবেশ শেখ আউয়াল।) তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র)-এর প্রিয় সঙ্গী ছিলেন। ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি বাগদাদ থেকে বঙ্গে আগমন করেন।

পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তর-পুরুষেরা অধুনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। জাতির জনক হচ্ছেন ইসলাম প্রচারক শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর। বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। নানার নাম ছিল শেখ আব্দুল মজিদ। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমানের (মৃত্যু ১৯৭৪ খ্রি.) সুখ্যাতি ছিল সূফী চরিত্রের অধিকারী হিসেবে। জাতির জনক নিজেও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ইসলামী তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

স্কুল জীবন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান মুসলমানদের প্রাণের সংগঠন মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবা সংঘের সেক্রেটারী, ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান ও ১৯৪১ সালে মাদারীপুরে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪১ সালে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতায় নামী-দামী কলেজে ভর্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতা ইসলামীয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে যেসব আন্দোলন হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তার অগ্রভাগে। তিনি ১৯৪৩ সালে জাতীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে শেখ মুজিবুর রহমান বছরের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসব ঘটনা প্রবাহ থেকে দেখা যায় তিনি সব সময় মুসলমানদের স্বার্থে পাকিস্তান আন্দোলনে মনেপ্রাণে জড়িত ছিলেন।

“তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণ ভাবে, বক্তৃতা করি, খেলার দিকে আর নজর নেই। শুধু মুসলিম লীগ আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নেই”। (তখন মানে ১৯৪১ সালে মেট্রিক পরীক্ষার পর) (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃ. ১৫)। উল্লেখ্য ১৯০৬ সালে মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করছেন তখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় কংগ্রেসে যোগদান করছেন দাদাভাই নওরোজির ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে। তবে শেখ মুজিবুর রহমান গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দেওয়া তাঁর বেতার ভাষণে। কুরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন পাসের বিপক্ষে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

> "আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসলাম, যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বার বার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের কথা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফারস্থা করে তোলার কাজে।"

তিনি আল্লাহর উপর কতটা আস্থাশীল ছিলেন তার প্রমান পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে। তিনি বলেছিলেন,

> "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ"। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের রাতে মৃত্যুর ভয়ে তিনি কোথাও পালিয়ে যাননি এবং পাকিস্তানের কারাগারে যখন তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয় তখন তাদের কে তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত না হয়ে বীরের মত বলেছেন, "তোমরা আমার লাশ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিও।"

১৯৭২ সালে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমার বিশ্বাস সর্বশক্তিমান আল্লাহই সে দিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন।"

তিনি কখনো তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনকারীদের মতো মৃত্যুর ভয়ে তোরাবোরা পাহাড়ে আত্মগোপন বা কারো কাছে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন নি বা প্রাণের ভয়ে পালাননি।

বঙ্গবন্ধু অসাধারণ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে যেমন খাঁটি বাঙালি ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন ঈমানদার মুসলমান। তাঁর অন্তর ছিল ইসলামের উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, সাম্য ও মৈত্রীর চিরন্তন আদর্শে উদ্ভাসিত। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে যে যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। নিম্নে বঙ্গবন্ধুর ইসলামের খেদমত, প্রচার ও প্রসারে অবদানসমূহ আলোকপাত করা হলো,

১. ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী দেশের মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা মুসলিম বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রের নামের আগে 'ইসলাম' শব্দটি সংযোজন করেছে। বাস্তবে অনৈসলামিক কাজ-কারবার সবই চলেছে। পাকিস্তান আমলে 'গেট-এ-ওয়ার্ড' নামে জুয়া খেলা চলতো। যা বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। উসমানিয়া খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা আরব দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মিল রয়েছে। আজকের ইরাক, সৌদী আরব, সিরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, মিশর, সুদান প্রভৃতি রাষ্ট্র তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এসব ভূখণ্ড স্বাধীন হওয়ার পর এসবের নামের আগে 'ইসলাম' শব্দটি সংযোজন করা হয়নি। এসব এলাকার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রের নাম রাখা হয়েছে। আর অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণে বাংলাদেশের বেলায়ও তাই করা হয়েছে। (আব্দুল আওয়াল, বঙ্গবন্ধু আমলে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা, অগ্রপথিক, ২০০৯, পৃ. ৫২)। ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হয় না। যারা ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা ফরাসি বিপ্লবে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা খুঁজে বেড়ায়, তারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি কটিয়ে উঠতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি সম্মানবোধ। এর লক্ষ্য হচ্ছে একাধিক ধর্মের অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। Longman Dictionary of Contemporary English-এর মতে 'A System of social organization which keeps out all forms of religion' সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর্ সরকার ব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনার জন্য আয়োজিত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

> “ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার স্ব-স্ব অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম, খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।”

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, উদার, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার অধিকারী এবং দূরদর্শী দেশনায়ক। তাঁর সরকার ইসলামকে শান্তি ও মানবতার চির কল্যাণকর বাংলাদেশের যমীনে স্বাধীনভাবে, দ্বিধাহীনভাবে, অবিকৃতভাবে বিচরণের অবাধ ও সহজ সুযোগ করে দিতে সংকল্প করলেন। আর এভাবেই বাংলাদেশের মাটিতে এক অনন্যসাধারণ ইতিহাসের গোড়াপত্তন করলেন।

বঙ্গবন্ধু ইসলামের খেদমতে ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ‘বায়তুল মোকাররম সোসাইটি’ এবং ‘ইসলামিক একাডেমী’ নামক তৎকালীন দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেলিন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা কী সাংঘাতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সরল, ধর্মপ্রাণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশ নিরক্ষর, ধর্মীয় ব্যাখ্যার ব্যাপারে তারা প্রধানতই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা যেটা, তা হলো ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের যথাযথ প্রচার, সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থের অভাব; অভাব রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একটি সুদৃঢ় এবং সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের। বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে এই অভাব

পূরণের সোনালী সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম, সমাজ কল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্তব্য করেন বলেছিলেন,

> ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বাংলাদেশ
> আস্থাশীল; এবং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি
> শান্তি বিশ্বজনীন সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে প্রয়াস
> চালিয়ে যাব।”

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এটি বর্তমানে সরকারী অর্থে পরিচালিত অন্যতম সর্ববৃহৎ ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবত আল-কুরআনুল কারীমের বাংলা তরজমা, তাফসীর, হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন ও কর্মের উপর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন ও দর্শন, ফাতাওয়া, ফিক্হ, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবী ও মনীষীগণের জীবনী ইত্যাদি বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হয়ে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশে ৬৪টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ২৮টি ইসলামীক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বৃহত্তর কলেবরে ২৮ খণ্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫ খণ্ডে সীরাত বিশ্বকোষ, ৬ খণ্ডে আল-কুর'আনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ প্রকাশ করে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে সাহাবা বিশ্বকোষ ও ওলামা বিশ্বকোষের কাজ দ্রততার সাথে এগিয়ে চলছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্টে এ প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। তা নিম্নরূপঃ

ক. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজ সেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

গ. সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের ওপর গবেষণা পরিচালনা।

ঘ. ইসলামের মেপৌলিক আদর্শ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায় বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক সামাজিক

ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ এর সুপারিশ করা।

ঙ. ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আয় ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তা প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা।

চ. ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা।

ছ. ইসলামের ইতিহাস ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আয় ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

জ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা।

ঝ. ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা।

ঞ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা।

ট. বায়তুল মুকারাম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধন করা।

ঠ. উপরোক্ত কার্যাবলির যে কোনোটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিত সব কাজ সম্পাদন করা।

৩. জাতীয় পর্যায়ে ঈদে-মিলাদুন্নবী (সা) পালন

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম হাক্কানী আলেম-ওলামাদের সংগঠিত করে পবিত্র ইসলামের সঠিক রূপ জনগণের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় সীরাত মজলিশ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। সীরাত মজলিশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাযতুল মুকাররম সমজিদ চত্বরে মাহফিলের উদ্বোধন করেন। একজন সরকার প্রধান হিসেবে জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিলের উদ্বোধন উপমাহাদেশের ইতিহাসে প্রথম দৃষ্টান্ত। এরই ধারাবাহিকাতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রতিবছর জাতীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদযাপন হয়ে আসছে। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। যাতে দেশের বড় বড় ওলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধাবলী লেখেন এবং তার প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে-মিলাদুন্নবী (সা), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষ্যে সরকারি

ছুটি ঘোষণা করেন। উল্লিখিত দিনসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪. হজ পালনের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা

পাকিস্তান আমলে হজ্জ যাত্রীদের জন্য কোনো সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম হজ্জ যাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং হজ্জ ভ্রমণ কর রহিত করেন। ফলে হজ্জ পালনকারীদের আর্থিক সাশ্রয় হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ২৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শাহাদাত লাভের কয়েকদিন পূর্বে অধ্যক্ষ ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরীকে গণভবনে দেখে বলেছিলেন, 'সরওয়ার! আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, এবার আমি হজ্জে যাব।' কিন্তু ঘাতকদের বুলেট বঙ্গবন্ধুর সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধু শাহাদাত লাভের পর যারা ক্ষমতায় ছিলেন, তারা কথায় কথায় নিজেদের ইসলামের সেবক দাবি করলেও তাদের আমলে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

৫. মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন

ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও দ্বীনিশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। পূর্বে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্ত শাসিত ছিল না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করে এর নাম রাখেন বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রসারের এক মাইলফলক। জাগতিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সরকারী চাকরির নিশ্চয়তা ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান তার বঙ্গবন্ধু যেমন দেখেছি গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মাদ্‌রাসার জন্য সরকারী অনুদান বন্ধের একটি প্রস্তাব সংবলিত নথি বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করা হলে বঙ্গবন্ধু ফাইলে লিখেন যে, মাদ্‌রাসা শিক্ষার জন্য যে বরাদ্দ এতদিন ছিল, সেটাই থাকবে। তবে ভবিষ্যতে এ বরাদ্দ আরও বাড়ানো যায় কিনা এবং কতটা বাড়ানো যায়, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬. বেতার ও টিভিতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে তারই নির্দেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পবিত্র কুরআন ও তার তাফসীর এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করার সুব্যবস্থা করা হয়। ফলে বেতার ও টিভিতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই এ ব্যবস্থা

চালু করা হয়। এ প্রচার ধারা আজও অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ইসলাম প্রীতিইর মূলে নিরন্তর অবদান রাখছে।

৭. মদ, জুয়া ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধকরণ

ইসলামের নাম নিয়ে পাকিস্তানীরা দেশ পরিচালনা করলে ও তাদের সময়ে মদ, জুয়া, নিষিদ্ধ ছিল না। অথচ বঙ্গবন্ধু সরকার আইন করে মদ, জুয়া, লটারি এবং গেট-এ-ওয়ার্ড প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এমনকি সুরকারি অনুষ্ঠানাদিতে বিদেশীদের জন্য মদ পরিবেশন বন্ধ করে দেন।

৮. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতা নিষিদ্ধকরণ

পাকিস্তানি আমলে ঢাকার বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। সেখানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতার নামে চলত জুয়া, হাউজি ও বাজিধরা প্রতিযোগীতা। এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে বাজিতে হেরে অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আমাদের প্রিয় নবী (সা) বৃক্ষরোপণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"যদি মনে কর আগামীকাল কিয়ামত হবে তবুও আজ একটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর।"

মহানবী (সা)-এর এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে বৃক্ষরোপণ করে সেই স্থানের নাম রাখেন "সোহরাওয়ার্দী উদ্যান"। ঢাকা মহানগরীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বৃক্ষরাজি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবহন করে চলেছে। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ইসলাম বিরোধী বহু কাজ হয়েছে। রেসের নামে জুয়া খেলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। আমি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দিয়েছি, পুলিশকে তৎপর হতে বলেছি, শহরের আনাচে কানাচে জুয়াড়িদের আড্ডা ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলি, ধর্ম নিরেপেক্ষতা ধর্মবিরোধিতা নয়। আমি মুসলমান। আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, দেখবেন এদেশে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড

কখনই হবে না।” (সৈয়দ আলী আহসান, বঙ্গবন্ধু যে রকম দেখেছি, পৃ. ১৬)।

৯. বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়দা বরাদ্দ

তাবলীগ জামাআত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়াই হচ্ছে এ সংগঠনের একমাত্র কাজ। এই সংগঠনটি যাতে বাংলাদেশে অবাধে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এ উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাআতের বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। তিনি তুরাগ নদীর তীরবর্তী জায়গাটি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করেন। সে হতে অদ্যাবধি তাবলিগ জামায়াত ওই স্থানে বিশ্ব এজতেমা করে আসছে। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াতী কাজে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার তাবলীগী ভাই এ জামাআতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমার এই স্থানটি বরাদ্দ করেছিলেন বলেই ইজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম এখানে সমবেত হয়ে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

১০. কাকরাইলের মারকাজ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ

বর্তমানে কাকরাইলের যে মসজিদে কেন্দ্রীয়ভাবে তাবলীগ জামাতের মারকাজ অনুষ্ঠিত হয় এ মসজিদটির পরিসর ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত ও অপ্রশস্ত। বঙ্গবন্ধু কাকরাইলের তাবলীগ জামাআতের মারকাজ মসজিদের জন্য স্থান বরাদ্দ করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় কাকরাইল মসজিদকে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করে দেন। তারই নির্দেশে মসজিদটি সম্প্রসারিত হয়।

১১. রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি কমিউনিস্ট দেশ। সেদেশে বিদেশ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য কেউ অনুমতি পেত না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া সহযোগিতা করায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেদেশের নেতৃবৃন্দের একটি সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার পর প্রথম রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে তাবলীগ জামাতের যেসব দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার ভিত্তি রচনা করেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১২. আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য

১৯৭৩ সালে আরব-ইসলারইল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই যুদ্ধে বাংলাদেশ তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ অবদান রাখার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লাখ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

১৩. ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগদান করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যদিয়েই বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বাংলাদেশের স্থান করে নেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে।

পরিশেষে এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় ইসলামের খেদমত, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য অবদান রাখেন। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে ইসলামের খেদমতে যে বিপুল পরিমাণ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অভূতপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন তা শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বতন্ত্র ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বহু সংখ্যক মাদ্রাসায় অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু, কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষা বোর্ড গঠন, কওমী মাদরাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি দান, কওমী মাদরাসার সর্বোচ্চ সনদকে মাস্টার্সের সমমান ঘোষণা, কওমী সনদধারীদের সরকারি চাকুরী প্রদান, অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি আধুনিক মডেল মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ইসলামের খেদমতে অবদান রাখছেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, অনুপম প্রতিভা, বাগ্মিতা, ইসলামের খেদমত, প্রচার-প্রসার অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের পথে পরিচালিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান সরকারের সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। যার মাধ্যমে ইসলামের বহুল প্রচার-প্রসার ঘটছে।♦

** প্রফেসর, লেখক, প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ল, রাজশাহী।*

১৫ আগস্ট, অতঃপর কিছু ভাবনা

মুহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার বাদল*

১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে একটি কলঙ্কিত দিন। ১৯৭৫ সালের এদিনে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে কতিপয় স্বার্থান্বেষী সামরিকজান্তা সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

যে ব্যক্তি তার সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য, বাংলার মানুষের স্বাধীকারের জন্য, স্বাধীন অস্তিত্বের জন্য, বাঙালির সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে এদেশেরই কিছু কুলাঙ্গার হত্যা করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন এই নির্মম হত্যাকাণ্ড একটি অমার্জনীয়, অমোচনীয় কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ৪৪ বছর গত হয়েছে, অথচ বঙ্গবন্ধু কেন নিহত হলেন, কেন এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল ঘাতকরা, কাদের ইন্ধনে, কারা এর ফলে বেনিফিসিয়ারি হলেন, কী তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সে সম্পর্কে আজও সঠিক কোন তথ্য জনগণ জানে না। জানানোর প্রয়োজনবোধ করেননি কেউ।

১৫ই আগস্ট এবং তার পরিবর্তিত পরিস্থিতি'র পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ, পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই. এর সহযোগিতায়

মীরজাফর মোশতাক গং এবং সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চভিলাষী অফিসারকে কাজে লাগিয়ে এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। সি.আই.এ-এ হত্যাযজ্ঞের রচয়িতা। সি.আই.এ- যে ১৫ আগস্ট এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে এর কিছু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে। প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ তার দি আনফিনিশড রেভ্যুলেশন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও অভ্যুত্থানের ঘটনাবলীতে মার্কিন সরকার ও সি.আই.এ-এর ভূমিকা নিয়ে অনেক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য তুলে ধরেছেন। সে সব তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, ১৫ আগস্ট এর এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সি.আই.এ।

এর একটি প্রমাণ হল এই যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার কয়েক মাস পর ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী মাক্রামেন্টোয় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তার নির্বাচনী প্রচারণায় ভাষণ দানের এক পর্যায়ে বললেন, চিলি বা বাংলাদেশের যেখানেই হোক, যে ধরনের গোপন অপারেশন চালানোর জন্য সি.আই.এ সমালোচিত হচ্ছে তিনি নির্বাচিত হলে সে সব বন্ধ করবেন। (লরেন্স লিফশুলজ এর গ্রন্থ থেকে) চিলির ব্যাপারে যে সি.আই.এ জড়িত ছিল তা সর্বজন সুবিদিত কিন্তু বাংলাদেশের প্রসঙ্গ যখন কার্টার টেনে আনেন তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, এটা মার্কিনীদের কাজ। এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা আছে, তা হল কার্টার কিভাবে জানেন? তিনি যখন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন। ব্যাখ্যা হল ফোর্ড প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী কার্টারকে বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কে নিয়মিত ব্রিফ করা হতো, সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশে সি.আই.এর অপারেশন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং একে প্রভাবিত করতে তিনি ইচ্ছা করে বিষয়টি তার নির্বাচনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারকালে সি.আই.এর পক্ষ থেকে দুজন শীর্ষস্থানীয় প্রার্থীকে গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত ব্রিফ করা হয়ে থাকে, প্রার্থীরা যদি ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট না হন তবুও। ১৯৭৫ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বলেছিলেন, তার যে কজন বিদেশি শত্রু আছে, শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অন্যতম। যে কোন ভাবে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করাই ছিল কিসিঞ্জারের লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস. আই ও জড়িত ছিল। কারণ, তারা মনে করতো বঙ্গবন্ধুর কারণেই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে, সেজন্যই বঙ্গবন্ধুর উপর তাদের প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে। তাই পাকিস্তান নিজের স্বার্থ

পুনরুদ্ধারের জন্য এবং বাংলাদেশের ভেতর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদদানের সুবিধার জন্য এ হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছিল।

এর প্রমাণ হিসেবে হত্যাকোণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং পরবর্তী শাসকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে আমরা নির্দ্বিধায় বুঝতে পারি। ৭১ সালে যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এবং পাকিস্তান ও কিসিঞ্জারের সাথে গোপন যোগাযোগ রেখেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্য, তারাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যে শাসকেরা ক্ষমতায় আসেন, তারা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে পদদলিত করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানীকরণ করতে শুরু করেন, তা থেকে কারো বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, আই.এস.আই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম, নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবময় বিজয় ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের প্রতি এক চরম আঘাত। এই হত্যাকাণ্ডে লাখো শহীদের রক্তে, মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধের চরম অবমাননার শামিল। ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয়বাংলা' নিষিদ্ধ করে পাকিস্তানি ভাবধারায় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনির প্রবর্তন এবং 'বাংলাদেশ বেতার' কে ' রেডিও বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে এদেশকে এক নব্য পাকিস্তানি রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এমনকি জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদল করেন চাঁদ তারা খচিত পতাকার স্লোগানও উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের চার মূলনীতিকে পদদলিত করে পরিকল্পিতভাবে সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে, বাঙালি জাতির জাতিগত আত্মপরিচয়কে রাতারাতি বাংলাদেশি জাতীয়তায় রূপান্তরিত করা হয়েছে বাঙালিকে জোর করে বাংলাদেশি বানানো হয়েছে, বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের সংস্কৃতির ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর এর সবই করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অন্যতম বেনিফিসিয়ারি ক্ষমতা দখলকারী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়া।

'৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, ঘাতক দালাল এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী রাজনীতিকে পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। '৭১-এ যারা ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে, যারা দু'লক্ষ মা বোনের ইজ্জত লুটেছে তাদেরকে এই বাংলার মাটিতে রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা নামধারী জেনারেল জিয়া। জিয়াকে তার দল মুক্তিযোদ্ধা বলে। আমি বলি সে ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা

পাকিস্তানী চর, পাকিস্তানী তল্পিবাহক, সে-ই সময় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশন সম্পর্কে পাকিস্তানীদের অবহিত করেছে।

যার কারণে আমার লাখো ভাইকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। এই জিয়াই সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানিদের অস্ত্র খালাস করেছে। সে- যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তার শাসন আমলে এর কোন প্রতিফলন দেশবাসী দেখেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ সমুন্নত রাখাতো দূরের কথা একে একে বিসর্জন দিয়েছিল জেনারেল জিয়া। শুধু কি তাই? রাজাকার, স্বাধীনতার শত্রুদের পুনর্বাসিত করেছিল, শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিল। স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে এদেশে জে. জিয়া। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শহীদদের জন্য জে. জিয়া কি করেছে? যা করেছে বঙ্গবন্ধুই করেছে, এখন জননেত্রী শেখ হাসিনা করছেন।

জিয়া যদি মুক্তিযোদ্ধাই হবেন তাহলে কি করে স্বাধীনতার রণধ্বনি জয়বাংলা নিষিদ্ধ করলেন? কি করে পাকিস্তানীদের আদলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ করলেন? কি করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে উপড়ে ফেললেন? কি করে শাজ আজিজের মত স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী বানালেন? কি করে রাজাকার আলবদরকে এদেশে রাজনীতি করার অধিকার দিলেন? (যা বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ করেছিল) কি করে নরঘাতক গোলাম আজমকে দেশে ফেরার অধিকার দিলেন? নাগরিকত্ব দিলেন? (যার নাগরিকত্ব বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার বিরোধীরা, রাষ্ট্রদ্রোহ, লাখো মানুষকে হত্যা, মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনে সহযোগিতার কারণে বাতিল করেছিল)। কি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানি ভাবধারায় দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন? রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিষ্ঠিত করলেন? এই সকল কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট যে, জিয়া বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের দোসর পাকিস্তানের দালাল ছিলেন। জে. জিয়ার এ কাজগুলো শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিরোধীই ছিল না এর পিছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সুদূর প্রসারী নীল নকশা।

জেনারেল জিয়া সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার পর পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন এরশাদ ও খালেদার পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার উপর যে আঘাত আসে তার চরম পরিণতি আজও গোটা দেশবাসীকে ভোগ করতে হচ্ছে। দেশে আজ মৌলবাদী জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মত কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি

বিকট চেহারায় আত্মপ্রকাশ এর চেষ্টা করেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার ষড়যন্ত্র করছে। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তালেবান স্টাইলে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে ওরা লিপ্ত।

মৌলবাদীরা আজ হুমকি দিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের, হুমকি দিচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের, তারা প্রকাশ্য জনসভায় স্লোগান দিচ্ছে আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান। এত সাহস তারা কোত্থেকে পায়। কে তাদের পৃষ্ঠপোষক? কেনইবা আজ রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের এই অবস্থা। পৃথিবীর মানুষ যখন মঙ্গলগ্রহে অবস্থান করার চিন্তাভাবনা করছে, তখন কেন মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্মের নামে জিগির তুলে উল্টো দিকে হাঁটতে জনগণকে উস্কে দিচ্ছে তালেবান হয়ে আফগানিস্তানের দিকে। কেন? ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, এসব কিছুর মূলে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড। তাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড শুধু গণতান্ত্রিক ধারাকেই নয় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গর্বিত স্বাধীনতারই নির্মম হত্যা। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো, স্বপ্নগুলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শগুলো সবকিছুই একে একে ধ্বংস করা হয়েছে এবং পাকিস্তানী ভাবধারায় দেশ পরিচালনা করেছে দীর্ঘ একুশ বছর।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীনতা বিরোধীদের আস্ফালন, অরাজকতা তৈরির প্রচেষ্টা, বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকারী, পরবর্তীতে গদি দখলকারী সামরিক জান্তা জিয়া-এরশাদ স্বৈরাচারী খালেদার আস্কারা এবং পৃষ্টপোষকতার ফল।

কারণ, সামরিক স্বৈরশাসক জিয়া, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করেছে বিদেশি দূতাবাসে চাকুরি দিয়ে। গোলাম আযমকে দেশে এনেছে, নাগরিকত্ব দিয়েছে। মৌলবাদীদের ধর্মের নামে রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে। পবিত্র সংবিধান থেকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো উচ্ছেদ করেছে। রাজাকার শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে, স্বাধীনতা বিরোধীদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পরবর্তীতে এরশাদ এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার নামে মৌলবাদীদের উস্কে দিয়েছে। মৌলবাদীদের মুরিদ সেজেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছে। রাজাকার মান্নানকে মন্ত্রী করেছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর খালেদা জিয়া, গোলাম আযম এর নাগরিকত্ব পুনঃবহাল করেছে, জামাত-শিবিরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছ। রাজাকার আবদুর রহমান বিশ্বাসকে দেশের

রাষ্ট্রপতি করেছে। রাজাকার মতিনকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়েছে। তার পূর্বসূরিদের মত মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাকিস্তানের তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করেছে। আজও স্বৈরাচারী খালেদা, জামাত-শিবির ও উগ্র মৌলবাদীদের নিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত।

দীর্ঘ একুশ বছর পর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খালেদার পতন ঘটিয়ে ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারী দল ক্ষমতায় এসেছে। পরবর্তী ২০০৮ ও ২০১৪ এর জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে বর্তমানেও ক্ষমতায় আসীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আজও স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার শেষ নেই। তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে উৎখাত করতে চায়। দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হোক চায় না, আজকে যখন দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল বন্ধ হচ্ছে, ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আইনের শাসন কায়েম হচ্ছে, আজ যখন মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে উচ্চাসনে আসীন করেছে সরকার, দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করছে, বিনামূল্যে খাদ্যসাহায্য দিচ্ছে, দীর্ঘদিন স্বাধীনতার যে চেতনা ও মূল্যবোধগুলোকে একে একে ধ্বংস করা হয়েছে, সেগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল, তখনই তারা নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ও বেনিফিসিয়ারি ঠাণ্ডা মাথার খুনি জিয়া এদেরকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গেছে। তার পথ ধরে স্বৈরাচার খালেদা তার কুপুত্র তারেক রহমান আজ একটি চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধীতা ও মৌলবাদীদেরকে নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার উৎখাতের জন্য নতুনভাবে ষড়যন্ত্র, তথ্য সন্ত্রাস, গুজব ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। এরা (১৯৯৯-২০০০ সালে) চট্টগ্রামে ছাত্রনেতাসহ আটজনকে হত্যা করেছে। সাংবাদিক শামছুর রহমানকে হত্যা করেছে যশোরে, খুলনায় আওয়ামীলীগ নেতা মেয়র প্রার্থী এস.এম. রব ও মঞ্জুরুল ইসলামকে হত্যা করেছে। গাজীপুরে আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করেছে, হবিগঞ্জে শাহ এম.এস কিবরিয়াকে (সাবেক অর্থমন্ত্রী) হত্যা করেছে। সারাদেশে বোমা হামলা চালিয়েছে। এসব হত্যা সন্ত্রাস করে তারা দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য এই মৌলবাদী গোষ্ঠী কোটালী পাড়ায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা পুঁতে রেখেছিল। খালেদা, এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা এই উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীকে দিয়ে

টাইম বোমা পুঁতে রেখে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তারা জানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যা করতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বলতে কিছু থাকবে না, দেশকে আবার পাকিস্তান বানানো যাবে, তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে।

তাই আজ সময় এসেছে অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা বিবৃতি আর নয়। এবার কঠিন শপথ নিতে হবে স্বাধীনতার পক্ষের সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে, যে আদর্শের ভিত্তিতে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের, দুলক্ষ মা- বোনের সম্ভমের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে '৭১ এর স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র চিরতরে রুখে দিতে হবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে।

ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি বন্ধ এবং ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিসমূহের আগ্রাসনকে শক্ত হতে দমন করে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। খালেদা, তারেক, জামাত শিবির ও উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, আস্ফালন, অরাজকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা, রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এটা প্রত্যেক প্রগতিশীল নাগরিক মাত্রেরই নৈতিক ও দেশপ্রেমিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ববোধ এবং যথার্থ ভূমিকা পালন না করলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। ইতিহাসের রায় বড় নির্মম।♦

*লেখক : মুক্তিযোদ্ধা সন্তান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পরিচালক।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু

আখতার হামিদ খান*

ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ে আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা-শেখ মুজিবুর রহমান। কখনও ইতিহাস নির্মাণ করে থাকে নির্বাচিত সেই কতিপয় জনকে, তারা ইতিহাসের সন্তান। কখনও তারাই ইতিহাস সৃজনের কর্মটি সম্ভব করে থাকেন। আবার কখনও বা একে অপরের পরিপূরক। মহাকালের পটে এমন উজ্জ্বল মানুষদের কথা আমাদের জানা রয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তেমনি একজন শেখ মুজিবকে অবলোকন করবার প্রয়াস পাচ্ছি, যিনি একটি মুক্ত দেশের প্রধানতম স্থপতি । কথাটাকে বরং আরেকভাবে উপস্থাপন করা যাক। তাতে করে বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। বর্তমানে শতকের এশিয়া ভূখণ্ড থেকেই উদাহরণ টেনে বলি আধুনিক তুরস্কের আতা কামালের ন্যায়, ভারতের বাপুজী গান্ধীর ন্যায়, ভিয়েতনামের আঙ্কল হোচিমিন'র - ন্যায় এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলা বাহুল্য, বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রকারের ত্রাতাপুরুষ যারা আপন নাম-পরিচিতির ঊর্ধ্বে এবং দেশ-সীমানা ছাড়িয়ে তাদের অবস্থান। তখন তারা মহাকালের সম্পদ। ভাগ্য আমাদের, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্রায়তন একটি প্রাচ্য দেশে সেই তাকে আমরা পেয়েছিলাম। ১৯৭১- এর বিশ্ব পরিস্থিতির কথা স্মরণ করি। সর্বত্র সর্বাধিক আলোচিত দুটি দেশ– ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ। এক দেশে মার্কিন বিমানবাহিনীর কার্পেট

বম্বিং, আরেক দেশে পাকিস্তানি সৈন্যের জেনোসাইড। আবার, প্রতিরোধে উভয় দেশেই সাধারণ গণমানুষের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এইখানে একটি প্রশ্ন- ইতিহাসের কদাপি কি এমন দ্বিতীয় নজির রয়েছে যে, দেশের সর্বাত্মক- প্রতিরোধ সংগ্রাম উজ্জীবিত হয়েছে এবং বিজয়ী হয়েছে। অনুপস্থিত নেতার প্রেরণায়? সবারইতো জানা, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওই সময়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেড় হাজার মাইল পশ্চিমে পাকিস্তানের জিন্দানখানায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দি। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেশদ্রোহিতার। তাহলে জিজ্ঞাসা-ঈমানের কী সেই প্রেরণা ওই সময়ে যা কোটি কোটিমানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল? ইতোমধ্যে কালব্যবধান অবশ্যই আমরা বিস্মৃত হইনি, আমাদের আন্তর-সত্যের মহৎ শপথ, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ে আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা' আমরা স্মরণ করব মরণজয়ী ওই মন্ত্র কেমন-আমাদের অকুতোভয়, দুঃসাহসী করে তুলেছিল শেখ মুজিব নামের মানুষটি তখন আর রক্তমাংসের পঞ্চইন্দ্রিয়ের দেহধারী মাত্র নন, আমাদের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে তিনি একটি অনড় অটুট বিশ্বাসে পরিণত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অবলোকন করবার প্রয়াস পাবে-বাসনা। এই প্রকারের তাই থেকে নানা কথা মনে আসছে। তৎপূর্বে একটি প্রশ্ন-প্রকৃতির রাজ্যেই হোক, কিংবা মানবজীবনেই হোক, ইহজাগতিকতার এলাকায় দৈব-ভূমিকা কতটা গ্রহণযোগ্য? অথবা কোনোই কার্যকারণহেতু নেই এমন আকস্মিকতার ভূমিকা? বিজ্ঞান বুদ্ধি তা সমর্থন করে না। অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতজন সন্ধান করেন বাস্তবতার পটভূমিতে। ইতিহাস যে সম্ভূত হয়ে ওঠে, নির্মিত হয় এবং বাঁক নেয়, ইতিহাসের গর্ভ থেকে যে নায়ক-সন্তানের জন্ম ওই দৈব বা আকস্মিকতা থেকে তিনি অবতীর্ণ হলেন, এমন হয় না। অবতারের ঠাঁই কল্পপুরাণে। ইতিহাসে নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব কথা। ১৯৬৬-তে যখন ৬ দফার ঘোষণা আর ১৯৭১-এর সাতই মার্চে রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমৃদ্ধে তার যে ঐতিহাসিক ভাষণ-ইতোমধ্যে সময়ে গড়িয়েছে পাঁচ বছর। আমরাই প্রত্যক্ষ করেছি, এই স্বল্পকাল ব্যবধানেই মানুষটি নেতৃত্বের আর ভালোবাসার কোনো অভ্রংলিহ শিখর দেশে ধূমকেতু বেগে উত্থিত হয়ে গেলেন। এ কি করাঙুলে গণনার কয়েকটি বছরের হিসাব মাত্র? কিংবা কোনো দৈব-নির্দেশের ব্যাপার? জিজ্ঞাসা এইখানে। বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের কর্মী, সংগঠক, নেতা কখন জনমত নির্বিশেষে সারাদেশের সাত কোটি মানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর আসনে অভিষিক্ত হয়ে গেছেন। অবশ্যই ইতিহাসে আকস্মিকতার অবকাশ নেই। ওই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের বিস্ময়কর দ্রুততায়

ইতিহাসের রথচক্রের আবর্তন ঘটে গেছে। অনুধাবন করতে চাই যে, কোটি মানুষের নিঃশঙ্ক নিশ্চিত নির্ভর কোথায় সেই জননেতা এমন ভাষায় নির্দেশ উচ্চারণ করতে পারেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা আর পেছনে ফিরে তাকাই নি, বজ্রকণ্ঠে তার অজেয় আহ্বান শুনেছি, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেই দিন কি তিনি অতি মানুষের পরিণত হয়েছিলেন? হবেও বা! আজকালের যে দূরত্বে। এসেছি, এখন নির্মোহ বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ওই বক্তৃতাটির বিশ্লেষণ করবার অবকাশ পাব। হা আবেগ অবশ্যই ছিল। দেশবাসী একান্ত চিত্তে তাই চাইছিল। ব্যাপারটা এক দিনের নয়, দীর্ঘ কালের । দীর্ঘকালব্যাপী মানুষের বঞ্চনা, ক্ষোভ, প্রতিবাদ এসব কিছু সংগঠিত করে একটি বিশেষ স্রোত মুখে বইয়ে দেবার ব্যাপক বিশাল কর্মকাণ্ড রয়েছে। সারাদেশের সর্বত্র। অ জু ক মীকে নিয়ে প্রতিরোধের প্রকারটি দৃঢ়মূল নির্মাণ করতে হয়েছে। আমাদের যাদের চোখে দেখবার অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিভিন্ন আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছেন তারা জানেন বাংলাদেশের ইতিহাস কাজ করে গেছে শেখ মুজিব নামের মানুষটির ভেতর দিয়ে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো তিনি। দুঃশাসনের নির্যাতনের শিকার। হেতু? হেতু স্বদেশ, স্বদেশের মানুষের জন্য কর্মসাধন। কত সংখ্যকবার যে বৈরী সরকারের হুলিয়া দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তাকে তাড়া করে ফিরেছে । ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ এই সময়কালে প্রায়শ কারাবাস, কারাভ্যন্তরে কখনও প্রতিবাদ অনশন, বাইরে রাজপথে যখন দুঃশাসনের সরকারবিরোধী মিছিলের নেতৃত্বে তখন পুলিশের লাঠিচার্জ-এইসব যেন তার অঙ্গসত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড সাংগঠনিক ক্ষমতা, অমিত সাহস, আর গভীর ভালোবাসা, মনে করি যে, এই তিনে মিলিয়ে মানুষটি শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিদানে দেশবাসীও তেমনি তাঁকে ওই ভালোবাসারই অপর নাম 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় হৃদয়ে আপন করে নিয়েছে। আমাদের রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর সঙ্গে খানিক উপমিত করতে পারি কেবল আরেক জনকে। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। উভয়েই এরা বাংলাদেশের অন্তর থেকে উঠে এসেছিলেন। দেশ তার গোপালগঞ্জ, সেইকালে দক্ষিণ বাংলার একটি অখ্যাতপ্রায় জনপদ। বংশ উপাধিতে শেখ বটে, তবে অবস্থান দূর মফস্বলের বাসিন্দা সাধারণ মধ্যবিত্তের অধিক নয়। পিতা শেখ লুৎফর রহমান আদালত অফিসে মোটামুটি ধরনের চাকরিজীবী ছিলেন। পরিণত বয়সে সাত কোটি বাঙালির কিংবদন্তিতুল্য নেতা শেখ মুজিবকে যথার্থ করে

চিনতে হলে ওই পটভূমিকা বুঝে নিতে হবে। তাঁর আপন শেকড়টা কোথায়? এবং তখন আমরা জানব, তার শৈশব-বাল্য-কৈশোর প্রথম যৌবনের লালন গ্রামীণ পরিমণ্ডলের ওই গোপালগঞ্জে। কথাটাকে এখন এইভাবে বলতে চাই, কৃষির আর নদীর বাংলায় ভিত তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিবের। পরবর্তীকালে জীবনের অধিকাংশই কাটালেন মেট্রোপলিটন সিটি কলকাতায়। ঢাকায়। তবে ঘনিষ্ঠজনেরা অধিকতর অবগত, আসলে মনেপ্রাণে গভীরতায় নগর কতটা অধিকার করেছিল তাকে। শেখ মুজিবুর রহমান যে আরেকজন সি.আর.দাস কিংবা এই এস সোহরাওয়ার্দী হননি, ধারণা করি মূলে কাজ করেছে ওই শেকড়ের সম্পর্ক। এইখানেই তার আপন অনন্যতা। অতঃপর এলেন কলকাতায় ১৯৪২-এ, ভর্তি হলেন ইসলামি কলেজে, জড়িয়ে পড়লেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির আন্দোলনের সঙ্গে। তার জন্য সেইটেই যেন স্বাভাবিক, অনিবার্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দু'বছর পূর্বে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন এবং সেই সময়ে সিরাজ দিবস' উদ্যাপনের সূত্রপাত, ওই সব কর্মকাণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ইসলামিয়া কলেজ থেকে মুসলমান ছাত্ররা অংশ নিয়েছিল । কলকাতায় রাজপথে-ময়দানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান ছাত্রদের সেই প্রথম শামিল হওয়া। পুলিশের লাঠিচার্জে ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। ঘরোয়া কথাবার্তায় স্মৃতিচারণ করছিলেন শেখ মুজিব । জানিয়েছিলেন, তাদের ইসলামিয়ার ছাত্রদের মধ্যে, বেকার হোস্টেলে, কারমাইকেল হোস্টেলে, ছেলেদের মধ্যে সেই তাপটা তখনও ছিল। পরে এসে তিনিও খানিক পেরেছিলেন। এরপর '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, যে বছর থেকে কলকাতায় মুজিবের ছাত্রজীবন। সারা দেশজুড়ে তখন গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ কুইট ইন্ডিয়া' 'ইংরেজ হটাও তুঙ্গে। এদিকে ১৯৪৪ নাগাদ মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমে দানা বাঁধছে, ছড়িয়ে পড়ছে নানান জায়গায়। মুসলমান ছাত্ররা জড়ো হচ্ছে অঙ্গসংগঠন মুসলিম ছাত্রলীগে । মূল কেন্দ্র কলকাতায় ওই ইসলামিয়া কলেজ। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তখনও দুটি ধারা-খানিকটা বামঘেঁষা এরা নুরুদ্দিন আহমেদ, মোয়াজ্জেম চৌধুরী, জহিরুদ্দিন আহমেদ, নুরুল আলম প্রমুখ। এখন থেকে পরিবারভুক্ত হলেন আরেক সহযোগী শেখ মুজিবুর রহমান। বলা গেছে কথাটা খানিকটা বামঘেঁষা উদারনৈতিক'-সমকালে এই ধরনের মানসভাবনার কাছাকাছি ছিলেন লেখক সাংবাদিকদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, হাবিবুল্লাহ বাহার, আবু জাফর শামসুদ্দিন, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, তালেবুর রহমান প্রমুখ। অবশ্য কমবেশি সবারই দীক্ষা দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র। হোমল্যান্ড পাকিস্তান

আন্দোলনে। চল্লিশের দশকে সেই সময়কার চেহারা কেমনতর ছিল নিরীক্ষণ করবার প্রয়োজনবোধ করছি। আমাদের মধ্যে বটে বিশ্বাস এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল পাকিস্তান আন্দোলনে । সেই সঙ্গে পাশাপাশি তৎকালীন ইতিহাস-চলচ্চিত্রের আরো একটা দিক ছিল গভীর তাৎপর্যবাহী ১৯৪৫-৪৬ -এ কলকাতায়, বাংলায় তথা সমগ্র ভারত বর্ষ জুড়ে তখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সে কি প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থান বোম্বাই করাচিতে নৌসেনাদের বিদ্রোহ, আইএনএ দিবস উদ্যাপন, ক্যাপ্টেন রশীদ আলির মুক্তি দাবি, শত সহস্র কণ্ঠে গর্জন 'চলো চলো দিল্লি চলো' 'লাল কিলা তোড়ে দো', সারা ভারতে ডাকুতার ধর্মঘট এবং গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার। আবার এদিকে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'লীগকংগ্রেস এক হও' স্লোগানে মিছিল, জামায়েত, মুসলিম লীগের অর্ধচন্দ্রখচিত সবুজ পতাকা, কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা আর দুয়ের মাঝে কমিউনিস্টদের কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকা-তিনটে একই গুচ্ছে বাঁধা-ছবিটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ক্রান্তিকালে পরাশক্তি অধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন দ্রুত পালাবদলের ক্রিয়া। স্বাভাবিক যে তার প্রভাব সর্ববিস্তারী হবে। বিশেষ করে তরুণ চিত্তে। এখন বুঝি, আর সহযোগীদের সঙ্গে ছাত্রকর্মী মুজিব বেড়ে উঠছে। দেশকালের সেই পটভূমিতে। কে জানত তখন মুসলিম লীগের পাকিস্তানিত্বের কোটর থেকে কোন অলক্ষ্যে জন্ম নিচ্ছে একজন, দুই যুগ অন্তের ভবিষ্যতেই তিনি হয়ে উঠবেন বাঙালিত্ব স্থাপনার মহত্তম নিশানবরদার। বর্ণনা করা গেল অবশ্য সংক্ষেপে, সরল বাক্যবিন্যাসে। তবে সচেতন জনের জানা রয়েছে, ইতিহাসের যাত্রাপথ মোটে সহজ নিশানার নয়। তা বহু বঙ্কিম, বহু ভঙ্গিম, পথ হারানোর এবং পুনরায় পথ খুঁজে পাওয়ার । এইখানে বলে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি যে, বর্তমান প্রয়াসটি ইতিহাস রচনার কিংবা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী রচনার নয়। বরং পূর্ব কথার পুনরুক্তি করি, বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন করবার প্রয়াস পাব। অন্তত কিয়দংশে হলেও সেই কাজটি সাধন করতে চেয়েছি ।

দুই

এই প্রজন্মের সন্তানের অবশ্য প্রাসঙ্গিক বহুবিধ কৌতূহল। অনেক কথা তারা জানতে চায়। কতিপয় উল্লেখ করিঃ ক. বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক কেবলই কি নির্বাচিত শব্দনিচয় মাত্র তা তো নয়। গভীরে ইতিবাচক ব্যঞ্জনাগর্ভ। ছিলেন রাজনৈতিক দলের একনিষ্ঠ আপোসহীন কর্মী। প্রত্যন্ত প্রদেশব্যাপী একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনুনির্মাণ কর্মকাণ্ডের দক্ষতায়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিসারী দুঃসাহসিক পরিচালনা কৃতিত্বে তিনি অনন্য নেতৃত্বে বরিত। তারপর কখন সেই

মানুষটি নিজেকে ছাড়িয়ে, দলীয় সংগঠনকে ছাড়িয়ে সমগ্র জাতির কোটি মানুষের পিতা হয়ে গেলেন। সবাই আমরা তাঁকে আত্মার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতম করে হৃদয়ে ধারণ করে নিলাম। যেমন কিনা আতাতুর্ক, মহাত্মাজী, আঙ্কল হোচিমিন। বুঝটা কি ছিল? আবেগটাই বা কি? খ. সংখ্যা গণনায় সুমার নেই কাতার শামিল লক্ষ লক্ষ মানুষ

অন্তরের গভীরে শ্রবণ করেছিল মরণজয়ী সেই ডাক এবারের। সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম...। হঠাৎ করেই ডাক এবং হঠাৎ করেই মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া-কদাপি এমন হয়

তাহলে অবশ্যই পেছনে রয়েছে অনেক কিছু। পেছনে রয়েছে বাংলার আপামর মানুষের দীর্ঘ বঞ্চনা-শোষণ-দাসত্বের চরম দুঃখগ্রাসিত জীবন। মুক্তি তাই থেকে। সর্বজনকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের সড়কটি নির্মাণ করে করে তবেই তো ওই ডাক। এবং অতএব মানুষেরা নিশঙ্ক আত্মোৎসর্গপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। পেছনের ওই ইতিহাসটা জানতে চাই। মুক্তি ব্যাপারটা সর্বার্থে, সর্বমাত্রিকতায় অনুধাবন করতে চাই। অন্যথায় অভিদানের দুই মলাটের বাইরে এবং মিছিল-সভামঞ্চের যান্ত্রিক স্লোগানকে ছাড়িয়ে কোথায় অবস্থান ওই মুক্তির? গ. বলি 'জয় বাংলা'। সহস্র কণ্ঠে বলেই আসছি। কী তাৎপর্য বহন করে শব্দ দুটি? কী শক্তি ধারণ করে? একাত্তরের রণাঙ্গনে অন্যতম। মরণাস্ত্রের অমোঘ ভূমিকা ছিল এই আওয়াজের। প্রশ্ন-কেন? ঘ. কত যে শ্রবণ করি, পাঠ করি, 'আবহমান বাংলা' হাজার বছরের বাংলা'। আদরে আদরে ভালো লাগে। তবে তাইতেই কি শেষ? এ যে আসলে আপন ঐতিহ্য উত্তরাধিকারের ইতিহাস। স্পষ্ট করে, বিস্তারিত করে সেই ইতিহাস জানব না? ঙ. বিষয়-জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' মার্চ সংগীত চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল জাতীয় পতাকা রক্তসূর্য লালিত সবুজ এই প্রকারের নির্বাচনের হেতু নিশ্চয়ই রয়েছে। হেতু কি জিজ্ঞাসু বাসনা রয়েই যায়। চ. আর, ওই যে ওদেরকে মার্কা-চিহ্নিত করা হয়ে থাকে 'আলবদর' বলে, 'আলশামস বলে, 'রাজাকার' বলে-ওদের গাত্রচর্ম থেকে, ওদের তাবৎ ইবলীসি কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে। নিলে শব্দ তিনটি তো ইতিহাস মোতাবেক অতি পবিত্র ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। তবে বাংলাদেশে এমনটি হয়ে গেল কী করে-কেন অমন ভয়ংকর ত্রাসের এবং কুৎসিত পারিভাষিক তাবাহী? তেমনি ভীতি-উদ্রেকী আরেকটি 'মৌলবাদ'। গভীরের অন্ধকারে নিহিত রহস্য কী? আরো অনেক রয়েছে এই রকমের, আমাদের নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে ব্যবহারে ব্যবহারে সবই যেন। স্পষ্ট করে, প্রখর করে বুঝতে পারছি না কিছু। বোধহীন মানুষে মানুষে দেশটা ভরে যাবে-মোটে কাঙ্ক্ষিত

নয়। তাতে করে পরিণতি সবারই জন্য অশুভ, নেতিসূচক। দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র-সরকারের, নেতৃত্বের, অভিভাবক-শিক্ষকদের। জ্যেষ্ঠ নাগরিকের। এই যাবৎকাল এই দায়িত্ব পালন করা হয়নি। অবহেলা আর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থচিন্তা দ্রুত প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তা গিয়ে বর্তাচ্ছে নিজেরই ঘরের সন্তানের ওপর। বাংলাদেশ' নামক মূল্যবোধে থেকে সন্তানেরা ক্রমে সরে যাচ্ছে এক বৈরী ভুবনে। পরিত্রাণের আশায় তাই আজ বিশেষ করেই জাতির স্থপতি সেই মহানকে স্মরণ করি। তিন. প্রসঙ্গ যদি বাংলাদেশ তবে প্রধানতই দুই জনের কথা বলতে হবে-হাজার বছরের বাংলার উজ্জ্বলতম দুই জ্যোতিষ্ক পুরুষ' শতাব্দীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপার্ধে শেখ মুজিবুর রহমান। যথার্থ যে, প্রকৃত সাধারণ আমরা তো তেমন করে চেতন ছিলাম না এই আমার বাংলা, আমার স্বদেশ মাতৃভূমি। রবীন্দ্র -মুজিবের মহৎ কীর্তি এক. চেতনাটি সর্বপ্রথম তারাই দুই-এ গভীর বিশ্বাস করে দেশময় ব্যাপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং দুই বাংলার মুখ তারা বিশ্বকে চিনিয়েছেন। কথাগুলো কি আমাদের জানা নয়? তথাপি বলতে হবে। কেননা জীবন প্রাণিত সত্যকে বারংবার উচ্চারণ করতে হয়, সমস্ত মানুষের মাঝে জানান দিতে হয়। বিশেষ প্রয়োজন বেড়ে উঠছে যে কিশোর-তরণ সেই প্রজন্মের স্বার্থে। রবীন্দ্রজীবনী পাঠক অবগত যে, প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল তার বসবাস বাংলাদেশের হৃদয় ভূমিতে। সেই খানে নদী পদ্মা-আত্রাই, ষড়ঋতুর বিচিত্র বিভঙ্গ, শিলাইদহ-শাজাদপুর, রামপুর, বোয়ালিয়া, ছোটো ছোটো গ্রাম আর ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখের গ্রামীণ মানুষ। অজস্র গানে, কবিতায়, গল্পে দেশটিকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করেছিলেন, নাম--'সোনার বাংলা'। এবং আমরা দীক্ষা নিলাম ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। পূর্বে তো এমন করে, এমন একান্ত আপন করে জানা ছিল না। আরেক মহৎ পুরুষ তদর্থে তিনি অবশ্য কবি নন, সর্বদেহ প্রাণমনে তিনি কর্মী, নির্মাতা, এবং স্বপ্ন দেখতেন তিনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো কাটিয়েছেন রাজনৈতিক নির্যাতনে, কারান্তরালে। আর যেহেতু তিনি স্বপ্ন দেখতেন, শতাব্দীর বিশেষ এক ক্রান্তিকালে বিশ্বের সবচাইতে আলোচিত ওই ব্যক্তিত্ব আমাদেরই ঘরের শেখ মুজিব। দু'য়ের মাঝে মিল খুঁজে পাই, যেইখানে মুজিবের আন্দোলনসংগ্রামের উদিষ্ট, আর স্বপ্নের দেশ কেমন এসে মিশে গেছে পূর্বোক্ত রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে-সেইখানেই তো ঠিকানা সোনার বাংলা'র। কবিতা-গান হোক, স্বপ্ন-সংগ্রাম হোক, অর্জিত শেষ সত্য- ১৯৭১ -এ বিশ্ব মানচিত্রে এক নবীন রাষ্ট্রের যোজনা, নাম-বাংলাদেশ। এখন পরপর সাজিয়ে যাব । ১৯১৩-তে এক ঐতিহাসিক অর্জন- অজ্ঞাত, আঞ্চলিক বাংলা ভাষার ভুবন জয়, ৪৮-৫২ তে ভাষা আন্দোলন এবং সেই কর্মকাণ্ড থেকে বাঙালিত্বের আত্মঅধিকার অভিযান,

অতঃপর '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান থেকে। ইতিহাস স্পষ্টই ধেয়ে গেল নিশ্চিত বাংলাদেশ' অভিমুখে। একদা নিকটজনের সহকর্মীদের মুজিব ভাই, সেই দিন ২৩ শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ মানুষের জমায়েতে অভিষিক্ত হয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু' অভিধায়। জয় বাংলা' 'বঙ্গবন্ধু' আর মুক্তিযুদ্ধ' তিনে মিলে যে কী উত্তাল তরঙ্গ 'লক্ষ পরানে শঙ্কা না মানে একাত্তরের দিনগুলো সেই স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। চার। বীরপূজার কথা নয়। তবে একটা জাতি যখন উঠছে বীরের প্রয়োজন অবশ্য থেকে থাকে। সেই মতো পুরুষ সিংহ বন্দি কোটি মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে তিনি সাহসের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আমাদের প্রত্যক্ষ জানা, বাংলাদেশের তেমনি হয়ে ওঠার কালে প্রেরিত ইতিহাসতুল্য মানুষটি শেখ মুজিব, আপন দেশবাসীর ভালোবাসার ডাকে বঙ্গবন্ধু। আজকের অবকাশে মনে পড়ছে, একই সড়কে যারা সহযাত্রী ওই মধ্যচল্লিশ থেকে, এবং পঞ্চাশের, ষাটের দশকে, তাদের তো অভিজ্ঞতায় রয়েছে 'মুজিব ভাই' থেকে তার বঙ্গবন্ধু'তে উত্তরণে ইতিবৃত্তান্ত। তারপর '৭৫-এর পনেরই আগস্টের কালরাত্রিতে অন্ধকারের দানবেরা হত্যা করল মরদেহের তাকে। অনেককাল আগে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' গান লিখেছিলেন ওই মহামানব আসে' এখন যখন প্রতিবাদী সংগ্রামী মানুষটিকে স্পষ্ট দেখতে পাই সামনে দাঁড়িয়ে শক্ত মেরুদণ্ডের দীর্ঘদেহী, উন্নত শির, প্রশস্ত ললাট, শূন্যে উত্থিত দক্ষিণ হস্ত ইমেজটা এবং ছবিটা কেমন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে আসে। বলাবাহুল্য, আমাদের বর্তমান দুঃসহ সংকটের কাল। বারবার বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত হচ্ছি। উত্তরণের আলোর রশ্মির আভাস কোথায়? কত জিজ্ঞাসা আমার উৎসুক সন্তানের চিত্তে। তবু রক্ষা যে, রিক্ত ক্লিষ্ট আমাদের এই জীবনের কখনো কখনো বিশেষ অবকাশ এসে থাকে। সন্তানকে তখন দৃঢ় অবলম্বনের। সন্ধান দিতে সমর্থ হই। অনেক কিছুর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জোরটা সেইখানে যেখানে আমাদের সবার জন্য গর্বের উৎসআমাদের তো হাজার বছরের আবহমান বাংলা, আমরাই করেছি ভাষা আন্দোলন, বিজয়ী হয়েছি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন এই বঙ্গে।♦

*সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, সাভার কলেজ

মুজিব বর্ষের আলোকে আমাদের বাংলাদেশ

মিলন সব্যসাচী*

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে যারা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশের সর্বাধিক নায়ক বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অন্যতম তাঁর তুলনা স্বদেশ প্রেমে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, ভাষা-আন্দোলনে খুঁজে পাওয়া দুসাধ্য। তিনি মৃত্যুময় শশ্মানের নিস্তব্ধতা মাখা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও নির্ভীক সৈনিকের মত বলেছিলেন 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলব আমি বাঙালি-বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ।' তাঁর বিপ্লবী বাসনা জাগ্রত চেতনায় বিশ্বদরবারে বীর বাঙালি উন্নতশিরে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী নেতৃত্ব সাতই মার্চের মর্মস্পর্শী মহাকাব্যিক ভাষণ এবং সীমাহীন সাহসী সংগ্রাম স্বজাতি ও স্বভূমিকে দিয়েছে হাজার বছরের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি এবং বিশ্ব বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা হিসেবে সাহসে, সংগ্রামে শীর্ষবিন্দু স্পর্শের গৌরব অর্জনে মানব জনম ধন্য। মুক্তিকামী মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ে এবং শেকড় সন্ধানী ইতিহাসের অমলিন অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব বর্ষ বরণে মুগ্ধ মুখর বিশ্ববাসী বিনম্র চিত্তের শ্রদ্ধায় অফুরন্ত ভালোবাসায় তাঁকে স্মরণ করবে অনন্তকাল।

১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান শহিদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাসণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' এই মহাকাব্য এবং রাজনীতির মহাকবিকে বাঙালি জাতি কোনো দিন ভুলবে না। পাপের রাজ্য রক্ষায় নিমগ্ন ঘৃণ্য-ঘাতক পাকসেনাদের অন্যায় অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যাযজ্ঞ, গণহত্যার বিরুদ্ধে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠা নির্যাতিত নিপীড়িত বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উদাম পায়ে, অর্ধনগ্ন শরীরে অকুতোভয় বাঙালি সম্মিলিত নারী-পুরুষ মুক্তির মোহনা খুঁজতে হন্য হয়ে ওঠেছিল। দল-মত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বুকের সাহসটুকু সম্বল করে প্রতিরোধ প্রতিশোধের দুর্গ গড়ে হাতে তুলে নিয়েছিল, গোলা, বারুদ ও রাইফেল। ঐক্যবদ্ধকণ্ঠে 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানের মাধ্যমে শত্রুসেনার বুকে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। পঁচিশে মার্চ কালোরাতের ভয়ঙ্কর গণহত্যা বাঙালিদের রক্তে অপ্রতিরোধ্য আগুনের নেলিহানশিখা জ্বেলে দিয়েছিল। বাঙালিরা চেয়েছিল স্বাধীন স্বপ্নীল জীবন না হয় অকাল মরণ। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিদগ্ধ দিনে ত্রিশ লক্ষ মানুষ

শহিদ হয়েছিল। নর ঘাতকরা কেড়ে নিয়েছিল দুই লক্ষ মা-বোনের স্বতিত্ত্ব-সম্ভ্রম। এমন ঘৃণিত কর্মকাণ্ডে পাকসেনাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পদলেহী দোষর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশদ্রোহী-শত্রুসংঘ আল বদর, আল শামস, রাজাকারসহ বাংলার কিছু কুসন্তান। তাদের জারজ বলেও অসংগত হবে না হয় তো। যাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে, ধর্ষণে, হত্যাযজ্ঞ এ ভূ-খণ্ড পরিণত হয়েছিল অমানুষ সৃষ্টি নরকে। বন্য পশুর হিংস্রতায় যারা স্তম্ভিত করেছিল দেশপ্রেমী মানুষকে। তবু তারা অদম্য গতিতে ছুটে চলছিল স্বাধীনতার সূর্যটাকে হাতের মুঠোয় ছিনিয়ে আনতে। নদীর প্রতিকূলে প্রবল অশ্রুস্রোতে শক্তহাতে ধরেছিল হাল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যাশিত স্বপ্নতরীর কর্ণধার ছিলেন শেখ মুজিব। পাকিস্তানের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের প্রাচীর ভেঙে দীর্ঘ নয়মাস মুক্তিযুদ্ধ করে।

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চে অবশেষে আমরা পেয়েছি শত জনমের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। মুক্তিসেনাদের মুখোমুখি যুদ্ধে পরাজিত পাকসেনারা নেড়ি কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালালেও থেমে থাকেনি কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও বাঙালিদের অর্জন ধুলায় লুটিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্যপ্রয়াসে লিপ্ত। পরিকল্পিত নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট মধ্যরাতে দিকভ্রান্ত সৈনিক নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করেছিল। একই বছর ৩ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চারস্তম্ভ জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে কারাগারের আঁধারকক্ষে হত্যা করেছিল। হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরেপেক্ষতার সমাধী রচনা করা। এমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর মহোৎসবে যারা মগ্ন মাতালের মতো উদ্বাহু নৃত্যে মেতে উঠেছিল সেই সব নব্য মীর জাফরদের মুখশ খুলে দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি। সচেতন জনতার দৃষ্টিতে চিহ্নিত হলেও তারা অপকৌশলে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। সালাম আজাদ এর ভাষায় তারা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস প্রচার করে। এমন কী বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে অবিস্মরণীয় অবদান পাকিস্তানপন্থি সবাই অস্বীকার করে। এই অপশক্তি বাংলার বুকে এখনও বহাল তবিয়তে থাকতে মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এ অপশক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকন্যা 'মাদার অফ হিউম্যানেটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উন্নয়নের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর সাথে আছে কোটি কোটি জাগ্রত জনতা। বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু সংগ্রামের সোনালি ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মানচিত্র। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে। এসব রাজ্যে

মাঝে মাঝে বহিরাগত শোষকরা আক্রমণ চালিয়েছে। বারবার সীমান্ত পরিবর্তনের কারণে বাঙালিদের রাজনৈতিক আনুগত্য বিকাশ সাধিত হয়নি। বাঙালির সমষ্টিগত চেতনার অভাব ছিল। বাঙালি চিন্তাবিদ ব্যক্তি স্বাধীনতার দর্শন, মার্কসবাদ, লোনিনবাদ মাওসেতুবাদ, সুফিবাদ, ইউরোপীয় মতবাদ ও পৌরাণিক ইতিহাস বৃত্তান্ত চর্চায় নিমগ্ন অথচ বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা, জাতি সত্তা ও স্বাধীনতা কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনার গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে অধ্যায়নে বৈরাগ্যভাব। যেন সহজ শর্তে স্বর্গ প্রাপ্তির তাচ্ছিলতায় আচ্ছন্ন প্রায় সকলে। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি বাঙালিদের স্বার্থের কথা বললেও পরাধীন বাঙালির স্বাধীনতা প্রসংগে তেমন উচ্চু কণ্ঠে কেউ কিছু বলেননি। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তখন ইউরোপীয় চিন্তাধারার স্রোতে প্রবাহমান ছিল। এমন কী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বতন্ত্র স্বাধীন ও স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতি বা রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেননি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম সাহিত্যিক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যিনি স্বাধীনতার পক্ষে ওপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ভাঙার গান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ‘পূর্ণ অভিনন্দন’ কবিতার একাংশে তিনি উল্লেখ করেছেন ‘জয় বাংলা’ তার বিদ্রোহী হৃদয় নিংসৃত এই উচ্চারণের অনুগত্য ছিল অমলিন। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘বাঙালির পেট্রিয়টিজম’ এ ভারতের ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, ‘ইউরোপের কোনো জাতির সঙ্গে অপর জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে’ অপর জাতির যে প্রভেদ রয়েছে।

১৯২৭ সালে নিখাঁদ স্বতন্ত্র বাঙালি রাষ্ট্র গঠনের কথা না বলে এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রশ্ন করেছিলেন ‘ভৌগলিক ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রমন্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাজ্য গঠনের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কি শুধু ভারতবর্ষে বিফল বলিয়া প্রমাণিত হইবে? এস ওয়াজেদ আলী তাঁর ভবিষ্যতের বাঙালি গ্রন্থে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা স্বাধীনের সবচেয়ে নিকটবর্তী কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগেই বঙ্গপ্রদেশের রোগাক্রান্ত শীর্ণ শরীর দ্বি-খন্ডিত হয়েছিল। বৃহত্তর বঙ্গের প্রতি বাঙালিদের আন্তরিকতার জন্য তৎকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ব্রিটেনের সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা শব্দটি লেখা হলেও সে স্বাধীনতা বাংলার স্বাধীনতা নয়। বাংলায় স্বাধীনতার কথা ইতোপূর্বে কেউ কখনও উচ্চারণ করেননি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় প্রত্যক্ষ ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে এমন হৃদয় বিদারক ঘটনায় খুব বেশি পীড়িত করেছিল হয়তো তখন থেকে তিনি বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খণ্ড স্বপ্ন দেখার সূচনা করেন। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিত্ত্বের জনক জিন্নাহ’র নেতৃতে

ধর্মও সম্প্রদায় কেন্দ্রিক ভাবনা নির্ভর এক রক্তস্নাত ইতিহাসের রক্তাক্ত পথের শেষান্তে জন্ম হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি সংখ্যাগুরু সম্প্রাদায়ের ওপর সংখ্যা লগিষ্ট উর্দুভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে এভাবেই শোষণভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার অপচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার পূর্বে পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে চরম ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল। পাকিস্তানের চক্রান্ত রুখে দিতে ভাষা-আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান রফিক, শফিক, সালাম, বরকত এবং নাম না জানা আরো অনেক দামাল ছেলেরা। আজন্ম ভাষাপ্রেমী শেখ মুজিব তখন কারাগারে বন্দি ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালিদের মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠলেও মূলত ভাষা-আন্দোলন থেকেই বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। ৫২-র রক্তাক্ত রাত বাঙালি জাতিকে দিয়েছে ৭১ র আলোকিত স্বাধীন স্বদেশ আর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তিম অশ্রুসিক্ত প্রিয় স্বাধীনতা। সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব এ জাতিকে দিয়েছেন স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ।

১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে তাঁর ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। একই বছর ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারি এই শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবিত প্রকাশিক হয়েছিল । ১০ মার্চে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট বলেন, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগে চাপাচাপি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়া হবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আইন ও পার্লামেন্টোরি দপ্তরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী ৬ দফাকে দেশ দ্রোহীতার নামান্তর বলে অবিহিত করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট প্রর্যন্ত সব দুর্ঘটনা অবাঙালি আমলা, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকেই পাকিস্তানের এক ইউনিটের পতন ঘটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের নাকমরণ করা হয়েছিল পাঞ্জাব। ১৯৭১ সালে পূর্ব বাঙলা হলো বাংলাদেশ ‘বাংলা ও দেশ এই দুটি শব্দই পাকিস্তানিদের কাছে অবাঞ্চিত বলে অভিহিত।

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। যে কারণে তারা আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ডাকে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আমূল পরিবর্তন প্রত্যাশী বাংলার যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে রণধ্বনি তুলেছিল ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর,

তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি। বাঙালি জাতির এই প্রাণের দাবি ভুট্টো সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ। তিনি বলেছিলেন 'ওদের দাবি তো স্বাধীনতার চেয়ে বেশি প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি। সামরিক জান্তাও বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। ২৬ মার্চ রাতে তারা শহিদ মিনার ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছিল যেখানে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হতো। তবুও থমকে দিতে পারেনি বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুক্তিসেনারা ও মিত্রসেনারা পাকসেনাদের পরাস্ত করে। তারা ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মেনে নেয়েছিল পরাজয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার হয়তো জন্ম হতো না ক্ষণজন্মা মহান নেতা শেখ মুজিবের জন্ম না হলে। দেশাত্মবোধের দিশারী জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষের অনাবিল অলোয় ভরে উঠুক সকল আঁধারাচ্ছন্ন আঙিনা 'জয় বাংলা'।♦

*লেখক : কবি , প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক।

মধুমতির খোকা

ইমরুল কায়েস*

মায়ের দেওয়া নাম 'খোকা', বাংলাদেশের দেয়া নাম 'বঙ্গবন্ধু' আর সারা বিশ্বের কাছে সর্বকালের সেরা বাঙালি; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা স্বপ্ন দেখতেন- ছেলে জজ-ব্যারিস্টার হবে, আর মা বলতেন, তাঁর খোকা অনেক বড় মানুষ হবে- গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে বিশাল নাম ডাক থাকবে। মায়ের বচন আর খোকার শৈশব আমাদের তাই বলে, যে সকালের সূর্য দেখে দিনকে চেনা যায়।

সেই সময়ের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের এক ছায়া সুনিবিড় সবুজ শ্যামল গ্রাম 'টুঙ্গিপাড়া'। গ্রামের অদূরেই বয়ে চলেছে মধুমতি নদী। যেমন সুন্দর সেই নদীর নাম, তেমন সুন্দর তার জলের ধারা। যেন দক্ষ কোন চিত্র শিল্পীর তুলির আচড়ে আঁকা ছবির মতই সুন্দর গ্রাম। এই গ্রামের কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বাঙ্গালীর তথা বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। বাড়িটির নাম শেখ বাড়ি। মধুমতির খালের পাড়ে বিশাল বাড়ি। খালের ঘাটে বাঁধা থাকত শেখ বাড়ির নৌকা। পাড়ে পাড়ে হিজল গাছ। তাল-নারকেল, সুপারি, বকুল, কদম ও সজনে গাছ ঘিরে পুরো বাড়িটি যেন একটি বনের মধ্যে যা প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরপুর। খোকার দাদার বাড়িটি গ্রামের আর দশটা বাড়ির মত নয়। বাড়ির একদিকে আছে এক বিশাল দালান। শুধু এই গ্রামে নয়; তখন আশে পাশে আর কোন গ্রামে এত বিশাল দালান দেখা যায় না।

শেখ বোরহানউদ্দিন ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ। তিনি টুঙ্গিপাড়ার এই শেখ বংশের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর দুই পুরুষ পরে-দুই ভাই শেখ একরামুল্লাহ ও শেখ কুদরতউল্লাহ। শেখ একরামউল্লাহ এর বংশধর শেখ আবদুল হামিদ। ইনি বঙ্গবন্ধুর পিতামহ। শেখ আবদুল হামিদের ছেলে শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান খোকার বাবা।

সকাল থেকেই শেখ বাড়ির আঙ্গিনা জুড়ে পাড়া প্রতিবেশী সহ আত্মীয় স্বজনের আনাগোনা। দিনটি ছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মা সায়েরা খাতুন ও শেখ লুৎফর রহমানের দুই বড় মেয়ের পর ছেলে সন্তানের আগমন ঘটেছে। সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে নাতির মুখ দেখে যেন নানার খুশির অন্ত নেই। বাড়ির আশপাশের সবাইকে ডেকে খুশির সংবাদ জানিয়ে বিশাল এক উৎসবের আয়োজন করলেন। আগত লোকজনের মধ্য থেকে একজন সায়েরা খাতুনকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের নাম কি? সায়েরা খাতুন বললেন, ও আমার ‘খোকা’। এ কে খোকা নামে সবাই ডাকো। তখন থেকে তার সারা পাড়া ও গ্রাম জুড়ে এই নাম। সে শুধু এখন টুঙ্গিপাড়ার খোকা নয়; বাংলার খোকা; বাঙ্গালির খোকা।

খোকার বড় দুই বোন বেগম ও ঠান্ডু। দুই বোনের আদরের দুলাল এই দুরন্ত ছোট্ট শিশু। খোকার পরে আসে আরেক বোন হেলেন। খোকা হেলেনকে কি যে আদর করত। সে যখন স্কুলে যেত- হেলেনের জন্য ঝুমঝুমি কিনে আনত। হেলেনকে বলত, তোর জন্যে পুতুল কিনে আনব। বল তুই কি পুতুল নিবি? হাতি ঘোড়া? যা তোর জন্য সুন্দর দেখে বর-বউ পুতুল নিয়ে আসব। ছোট বোন হেলেনের পরে খোকার আরেক আদরের ছোট ভাই আসে সে হল নাসের। নাসেরের সাথে খোকার খেলা না করলে চলেই না। পাঁচ ভাই বোনের সাজানো বাগানে খোকাই যেন মধ্য মণি ও বাগানের বড় লাল গোলাপ ফুল।

খোকা সারাদিন বাড়ির উঠানে খেলে বেড়াত, পুরো উঠান জুড়েই তার রাজত্ব। তার খালা ও ফুফুদের কোন ছেলে ছিল না তাই পরিবারের সবারই আদর আর মনোযোগ ছিল খোকার প্রতি। উঠানে মোরগ মুরগী তাড়া করা, বর্ষার দিনে পায়ে কাদা লাগলে কে খোকার পা ধুয়ে দিবে তা নিয়ে সবার মধ্যে টানাটানি শুরু হয়। খোকার নানার বাড়ি তার বাড়ির পাশেই তাই খোকার সেখানে আলাদা আদর। নানা বাড়ির কেউ মুড়ি ও মুড়কি নিয়ে আসে, কেউ ফলমূল নিয়ে আসেন। খালের পাড়ে বসে থাকা নৌকা দেখা। জেলেদের নৌকা দেখা, মাছ ধরা, মধুমতির ঘাটে লঞ্চ দেখা এসব দেখে খোকার শৈশব কাটে। বোনদের সাহায্য নিয়ে পুকুরে সাঁতার শেখার চেষ্টা।

বাল্যকালে খোকা তাঁর আব্বার কাছে লেখাপড়া শেখে। পরে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছে; "আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না।" বাড়ির বৈঠকখানায় বসে খুব সকালে মৌলভী সাহেবের কাছে সুর করে আমপারা পড়া। আমপারা পড়তে খোকার বেশ মজাই লাগে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খোকার বাংলা, অংক আর ইতিহাস পড়া শুরু হয়। নোয়াখালী থেকে আসা সাখাওয়াৎ উল্লাহ মাষ্টারের কাছে বাংলা, অংক, ইতিহাস শেখে।

সাত বছর বয়সে প্রথম গ্রামের গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। এর দুই বছর পর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি। পিতার বদলির কারণে মাদারীপুরেও লেখাপড়া করতে হয়। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি। ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। পরে দেশ ভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়।

ছোট বেলা থেকেই খোকা অন্যের কথা ভাবত। মা সায়েরা খাতুন ছেলের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করলে সে বলত, বারে! খালি আমি খাবো অন্যেরা খাবে না? মায়ের খোকার মুখে এসব কথা শুনে ভাল লাগত। এতটুকু ছেলে কেবল নিজের কথা নয় অন্যের কথাও ভাবে। একদিকে সবার প্রতি মায়া মমতা, অন্যদিকে দুরন্তপনা ও চঞ্চলতা, এই হচ্ছে খোকার প্রকৃতি। কখনো বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় সে, কখনো অন্যদের সঙ্গে দল বেঁধে মধুমতি নদীতে মাছ ধরতে যায়। খেলা ধুলায় খুব আগ্রহী ছিল খোকা। দাড়িয়াবান্ধা, কাবাডি, গোল্লাছুট সব খেলাতেই ছিল তার আগ্রহ। খোকা ফুটবল খেলায় খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। গ্রামে, এলাকায়, আশ পাশের জেলা গুলোতে তার নামডাক ছিল। ফুটবল দলের ক্যাপটেন হতো। খেলাধুলা ছাড়াও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত খোকা। কখনো দেখা যেত যে, লুঙ্গি কিংবা গামছা দিয়ে মাছ ধরতে পানিতে নেমে পড়েছে। কখনো কৃষকের লাঙ্গল হাতে নিয়ে হালচাষ করার মহড়া দিচ্ছে। এসব কাজে শরীরের চেয়ে মনের জোরই ছিল বেশী।

খোকা পথে এক বৃদ্ধকে শীতে কাঁপতে দেখে তার গায়ের দামি চাদরটি তাকে পরিয়ে দেয়। পরে বাড়ি আসলে বাবা জিজ্ঞেস করে, খোকা তোর চাদর কোথায় রে? চাদর দেয়ার ঘটনা শুনে বাবা থেমে যান- খোকা বাবাকে বলে গরম কাপড় বলেই তো তাকে দিয়ে দিলাম। নইলে বুড়ো মানুষের শীত মানবে কি করে? আরেকটি ঘটনা- স্কুল ছুটি হলে খোকা তার ছাতা এক বন্ধুকে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি আসলে তাঁর দাদি জিজ্ঞেস করলেন- খোকা? ছাতা কোথায় ফেলে

এলি? সে বলে- বন্ধুকে দিয়ে এসেছি। ওর বাড়ি অনেক দূরে। অতটা পথ ভিজে ভিজে বাড়ি যাবে কি করে? তাই ছাতাটা বন্ধুকে দিয়ে এলাম।

গরীব মানুষদের প্রতি ওর গভীর টান, দুস্থদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো, সব কিছু মিলে খোকা সমবয়সীদের মধ্যমণি হয়ে উঠল। মিশনারী স্কুলে পড়ার সময় খোকার পড়ার জন্য বাবা হামিদ মাষ্টারকে বাড়িতে এনে রেখে দিলেন। হামিদ মাষ্টারের প্রেরণায় খোকা সমাজের গরীব, দুস্থ মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর নাম দেয়া হয় 'মুসলিম সেবা সমিতি'। সমিতির সদস্যরা সবাই ছাত্র। তাই তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে অভাবী ও গরীব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করত।

আজকের শিশু যে আগামীর ভবিষ্যৎ এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক বাংলার খোকার জন্য। শৈশবে যার মহৎ কীর্তি, মানব প্রেম, নেতৃত্ব ও নেতা সুলভ সমাজ সেবা সেই তো তার মায়ের ছোট বেলায় বলা; আমার ছেলের একদিন অনেক নাম ডাক হবে; মায়ের স্বপ্ন অধরা থাকেনি। বঙ্গবন্ধু পরবর্তী জীবনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, প্রথম রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সর্বোপরি জাতির পিতা হিসেবে ভূষিত হয়েছেন। প্রথম বাংলাদেশের সদ্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেছেন। এই মহান আত্মসংযমী ও মহৎ নেতা ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট একদল বিশ্বাস ঘাতকের অস্ত্রের গোলায় শাহাদাৎ বরণ করেন। বাংলাদেশ হারায় তার আদুরে খোকা-শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাই তো আমরা কবির ভাষায় বলি-

যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা গৌরি
যমুনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।।♦

*সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বঙ্গবন্ধু : ছড়া-কবিতায়

দেলওয়ার বিন রশিদ*

বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির দূত। তিনিই বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন আশা ও সংগ্রামের সমন্বয়ক। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির বুকে যে স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন, নিজেই তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করে গেছেন। বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণের তিনিই মহানায়ক।

বাঙালি জাতিকে ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও হৃদয়ের ভালোবাসার শক্তিতে বাঙালিকে একতাবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তার ফলস্বরূপ আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল ও অম্লান।

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা। বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নানা নির্যাতন, জেল-জুলুম, কারাবাস সহ্য করেছেন। তাঁরই কষ্টার্জিত অর্জন এই স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর নাম তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু নয়, সমগ্র জাতির মানসে চির অম্লান ও চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ব্রিটিশ শাসিত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন।

শৈশব কৈশোর থেকেই তিনি এ দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। স্বপ্ন দেখছিলেন সব মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার। দেশ ও মানুষের কল্যাণে তিনি জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন, যার কারণে তার জীবনের দীর্ঘসময় কারা অন্তরালে কেটেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ইতিহাসের স্বর্নাভ অধ্যায় সৃষ্টিকারী, বাঁক ঘোরানো মহান কৃতি পুরুষ। সর্বশেষে জীবনের বিনিময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসের আরেক হৃদয়বিদারক রক্তাক্ত অধ্যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করে বিপথগামী কতিপয় সেনাসদস্য। ঘাতকের বুলেটের নির্মম আঘাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে সেদিন শাহাদাতবরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে কিন্তু বাঙালি জাতির হৃদয়ের আসনে তিনি চির ভাস্বর, অম্লান। বাঙালির হৃদয়ের মনিকোঠায় তিনি অধিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় রচিত হচ্ছে হৃদয় ছোঁয়া, করুণ, শোকাবহ সাহিত্য, ছড়া, কবিতা, গান।

বর্তমান এই লেখাটিতে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ছড়া, কবিতা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস। এদেশের প্রায় সব খ্যাতিমান ছড়াকারগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা ছড়া লিখেছেন। অগ্রজদের মধ্যে জসীমউদ্দীন, সুফিয়া কামাল, রোকনুজ্জামান খান, সিকান্দার আবু জাফর, শওকত ওসমান, আতোয়ার রহমান, শামসুর রাহমান, সুকুমার বড়ুয়া, ফজল-এ-খোদা, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, হায়াৎ মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, সুব্রত বড়ুয়া, রফিক আজাদ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, হাবীব উল্লাহ্ সিরাজী প্রমুখ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা ছড়া লিখেছেন।

কবি জসীম উদদীন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৭০ লাইনের দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় লিখেছেন। কবিতাটির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

মুজিবুর রহমান
এই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিউগারী বন।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বালিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে;
বিগত দিনের যত অন্যায়, অবিচার ভরা যার;
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান দিল প্রকাশের মুখে,
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরনী ভরি

(বঙ্গবন্ধু, রচনা ১৯৭১)

কবিতাটি বিষয় বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী, পাঠকপ্রিয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শোকাবহ ঘটনা সুফিয়া কামালের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। তিনি অসাধারণ এক কবিতা রচনা করেন:

এই বাংলার আকাশ বাতাস, সাগর, গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি

হেরিতে এখনও মনের হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ মরিছে তোমার মাতা পিতা বোন ভ্রাতা।
যত অসহায় অক্ষম আর উপেক্ষিতরা সব
করুন নয়নে হেরিছে এদেশে বিলাসের উৎসব
শূণ্য উদরে সুরম্য পথে চলিতে চলিতে তারা
ভাবিছে তোমার এদেশে আবার আসিয়া বসিল কারা?
তোমার জীবন যৌবন ভরি সুদীর্ঘ কারাবাস
মুক্ত করিল, স্বাধীন করিল মুক্তির নিঃশ্বাস
ত্যাজিয়া মানুষ বাংলার মাটি বাংলার এ বাতাসে
তোমারই দেয়া মুক্তির বাণী জীবনের আশ্বাসে
গাহিয়া উঠিন গান
তোমার বিহনে ব্যাহত হয়েছে লক্ষ মানব প্রাণ।

(ডাকিছে তোমার)

এ কবিতাটি বাংলার মানুষের মুখে মুখে এখন। হৃদয়বিদারক কবিতা এটি, মানুষের মনের ভাষা এতে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে এই বাংলার আকাশ বাতাস ডাকিছে।

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার অংশ বিশেষ :

জেল জুলুমে দিন কাটে তার
ভয় পায় না মোটে
মুক্তি পেলে তার মিছিলে
সবাই এসে জোটে।
গাছের পাতা ধূলিকণা
বলছে অবিরাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
অমর তোমার নাম।

(অমর নাম)

ছড়াকার রোকনুজ্জামান খান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখলেন ‘মুজিব’ নামে চমৎকার একটি লেখা, যার অংশবিশেষ:

সবুজ শ্যামল জন্মভূমি মাঠ নদী-তীর বালুচর
সবখানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।

(মুজিব)

কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা :

মুজিব অর্থ আর কিছু না

মুজিব অর্থ মুক্তি
পিতার সাথে সন্তানের
না লেখা প্রেম চুক্তি।
মুজিব অর্থ আর কিছু না
মুজিব মানে শক্তি
উন্নত শির বীর বাঙালীর
চিরকালের ভক্তি।

(মুজিব অর্থ)

মুজিব অর্থ মুক্তি, মুজিব মানে শক্তি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এ কবিতায়।

কবি ফজল-এ-খোদা'র কবিতার অংশবিশেষ :

জাগ্রত সত্তার মূর্ত প্রতীক
মৃত্যুর মঞ্চে বিস্ময় পথিক
মানবতা, শান্তির গেয়ে গেছে গান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া লিখলেন :

মুজিবের বুকে অস্ত্র চালিয়ে
দু'হাত রাঙিয়ে খুনে
খুনিরা অবাক আকাশ বাতাসে
বজ্র কণ্ঠ শুনে
সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা
দ্বিগুণ জনতা আজ।
স্বদেশে বিদেশে সবার চিত্তে
জীবন্ত মহারাজ

(বিশাল মুজিব)

বিশিষ্ট লেখক সুব্রত বড়ুয়ার 'চিরকাল এ মাটিকে ঘিরে' কবিতাটির বক্তব্য প্রধান, তার অংশবিশেষ

একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় একটি পতাকা
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় একটি স্বদেশ
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় ছিন্নপত্রে আঁকা
একটি মানুষ বুঝি হয়ে যায় অনির্বান রেশ।

(চিরকাল এ মাটিকে ঘিরে)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি-ছড়াকারগণ অনেক মর্মস্পর্শী কবিতা লিখে চলেছেন প্রতিনিয়ত। প্রায় সব কবি-ছড়াকারগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন আপন আপন মেধা মননে। কবি আসাদ চৌধুরীর ‘আমাকে দিয়েছিলে তুমি অসীম আকাশ’। রফিক আজাদের ‘এই সিড়ি’, হাবীব উল্লাহ সিরাজীর ‘যে তোমারই নাম’, মুহাম্মদ নূরুল হুদার ‘টুঙ্গিপাড়ার খোকাবাবু’ উল্লেখযোগ্য কবিতা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরো যাদের ছড়া কবিতায় মূর্ত হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে রফিকুল হক, রবীন্দ্র গোপ, বেবী মওদুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হুদা, শামসুল ইসলাম, ফারুক নওয়াজ, মুস্তফা মাসুদ, সুজন বড়ুয়া, আখতার হুসেন, মাহমুদউল্লাহ, আমীরুল ইসলাম, আসলাম সানী, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, রুহুল আমিন বাবুল, দেলওয়ার বিন রশিদ, ইয়াফেস ওসমান, খালেক বিন জায়নউদ্দিন, আহসান মালেক, রাশেদ রউফ, শিবু কান্তি দাশ, শাহাবুদ্দিন নাগরী, আবু হাসান শাহরিয়ার, জাহাঙ্গীর আলম আজান, শফিকুর রাহী, সিরাজুল ফরিদ, উৎকান্তি বড়ুয়া, রহিম শাহ, আমিনুর রহমান সুলতান, জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ, ওয়াসিফ-এ-খোদা, রমজান মাহমুদ, মঈনুল হক চৌধুরী, মানসুর মুজাম্মিল, কামাল হোসাইন, আনজীর লিটন, মিয়া মনসফ, ফারুক হোসেন, মিলন সব্যসাচী, মামুন সারওয়ার, সোহেল মল্লিক, যাযাবর মিন্টু, বোরহান মাসুদ।

স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ছড়াকার ফারুক নওয়াজ লিখলেন ছড়া ‘এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই’ তার অংশবিশেষ :

করতে স্বাধীন একটি স্বদেশ/ হয় পতাকা সবুজ লাল/ এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই/ কাটল জাতির হাজারকাল। *(এক মুজিবের প্রতীক্ষাতেই)*

ছড়া শিল্পী আসলাম সানীর ছড়াঃ

এই প্রকৃতি আকাশ বাতাস/ সবই আছে ঠিকই,/ সাগর পাহাড় নদী আছে/ তারার ঝিকিমিকি/ কিন্তু মাগো বলতে পারিস/ শেখ মুজিবুর কই/ তাঁরই আশায় আজো আমি/ একলা জেগে রই। *(জাতির পিতা কই)*

ছড়াকার সুজন বড়ুয়া সবসময়ই লেখায় নতুনত্ব উপহার দেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখায়ও লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ

বাংলাদেশের নাম বললেই যে নামটি আসে আগে/ হাওয়া কথা বলে/ নদী যায় চলে/ সে নামের অনুরাগে/ জাগে ঢেউ দোলা/ ঝঙ্কার তোলা/ সে নাম যে মহীয়ান/ বঙ্গবন্ধু প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। *(বাংলাদেশের সাথে)*

ছড়াকার আমিরুল ইসলাম লিখেছেন :

বজ্রকঠোর কুসুম কোমল/ বিস্ময়কর শেখ মুজিব/ স্মরণযোগ্য পূণ্য আত্মা/ পুরুষসিংহ শেখ মুজিব। *(শেখ মুজিব)*

ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়া:

নাম লিখে রাখলাম/ ফরিদপুরের অখ্যাত এক/ টুঙ্গিপাড়া গ্রাম/ ইতিহাসে টুঙ্গিপাড়ার/ নাম লিখে রাখলাম।/ এই গ্রামেরই সোনার ছেলে/ নামটা মুজিবুর যার কণ্ঠে উচ্চারিত/ শেকল ভাঙ্গার সুর। *(একটি ছেলের কথা)*

ছড়াশিল্পী মুস্তফা মাসুদের ছড়া :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তিনি/ তাঁর কাছে এই দেশের মানুষ/ অশেষ ঋণে ঋণী।/ বুক ভরা তাঁর ছিল ভালোবাসা/ চোখের কোণে হাজার স্বপ্ন আশা/ এই দুখিনী দেশ যেন হয়/ ধন্যি, গরবিনী। *(বঙ্গবন্ধু)*

ছড়াকার সিরাজুল ফরিদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ছড়ায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তার ছড়া:

কার বিদেহী আত্মা এসে/ বুকের ভেতর বাঁধলো ঘর?/ সবার প্রিয় জাতির পিতা/ বঙ্গবন্ধু মুজিবর।/ *(বঙ্গবন্ধু)*

ছড়াকার জাহাঙ্গীর আলম জাহানের ছড়ার অংশবিশেষ:

তাঁর তুলনা তিনি/ সবাই তাঁকে চিনি/ মহান পুরুষ জাতির পিতা বন্ধু জানি সবার/ এসো সবাই চেষ্টা করি তাঁর মতনই হবার।/ স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা আর চেতনা যত/ শেকল ভাঙার সাহস এবং দেশ স্বাধীনের ব্রত/ তিনিই শেখান এই জাতিকে, দেন প্রেরণা তিনি/ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় আমরা তাকে চিনি। *(তিনি জাতির পিতা)*

ছড়াকার ওয়াসিফ-এ-খোদার ছড়ার অংশবিশেষ :

সাতই মার্চে শেখ মুজিবের/ অনলবর্ষী কাব্যকথা/ একাত্তরের রক্ত নদী/ সাঁতরে পেলাম স্বাধীনতা। *(৫২ থেকে ৭১)*

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছড়া-কবিতা লেখালেখির সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁকে নিয়ে ছড়াকার-কবিগণ হৃদয়ের ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় অবিরাম লিখে চলেছেন, যার পরিধি বিশাল।

বাঙালির রাজনৈতিক দার্শনিক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরকাল শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় বাংলার মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় যেমন সযতনে সতত থাকবেন, তেমিন প্রতিনিয়ত লেখা হবে তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন ছড়া-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, স্বর্ণাভ ইতিহাস।♦

আজও নীল বাংলার আকাশ তাই হয়ে ওঠে লাল

সৈয়দ শামসুল হক

এ মাটি বাংলার মাটি, আর এই মাটির ভেতর
লীন হয়ে একজন, বুক তার আকাশ বিশাল,
সেই বুক থেকে রক্ত পঁচাত্তরে ঝরেছে অঝোর-
আজও নীল বাংলার আকাশ তাই হয়ে ওঠে লাল-
যখন ভোরের বেলা সূর্য ওঠে উদয় সীমায়
তাঁরই রক্তে জেগে ওঠে বাংলাদেশ, স্বপ্নের সমূহ
যখন সন্ধ্যার কালে পশ্চিমের রঙ বদলায়
তাঁরই রক্তে পূর্ণিমার আলো কাটে অমাবস্যা ব্যূহ;
মনে পড়ে একাত্তরে জয় বাংলা ধ্বনিতে তাঁরই তো
হাজার বছর পরে জেগে ওঠে এই বাংলাদেশ,
মুক্তিযুদ্ধে যায় তাঁরই স্বাধীনতা ঘোষণা প্রাণিত-
সশস্ত্র সংগ্রামে নামে, সারাদেশ পরে যোদ্ধবেশ।
স্বপ্নবান তাঁরই হাতে জন্ম হয় দুর্জয় জাতির-
তিনিই বাংলাদেশ, তিনি পিতা,
আমাদের ইতিহাসে অশ্রু ও অগ্নির।

লন্ডন, ১ আগস্ট ২০১৬

সৌজন্যে : দৈনিক সমকাল ১৫ আগস্ট ২০১৬

শোণিতে এঁকেছে স্বদেশের মুখ

সোহরাব পাশা

এখানে আঙুলে ফোটে আগুনের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল
শ্রেষ্ঠশিল্পী মুক্তিসেনা শোণিতে এঁকেছে স্বদেশের মুখ
মেঘলা সন্ধ্যায় বিরুদ্ধ হাওয়ায় মাথা নত করে না এদেশ
শহিদ মিনারগুলো অনুবাদ করে প্রাণের পঙক্তিমালা
ওরা আঁধার রাতের দৃপ্ত আলোর মিছিল–অমিত সাহস
দূরবর্তী বেভুল দ্বীপের জ্যোতির্ময় বাতিঘর

এইখানে জ্বলে ক্ষিপ্র সূর্যের অপূর্ব চিত্রকল্প
অমিতাভ চেতনায় বিনিদ্র রবীন্দ্র-নজরুল
রংধনু রোদের শব্দে আঁকা সেরা কবি জয়নুল
এইখানে হঠাৎ বিষণ্ন রাত্রি নামে–বেদনায়
পাখিরাও ভুলে যায় ডানায় রচিত স্বপ্নভাষা
পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট শোকভেজা স্বরলিপি
আমার প্রাণের বর্ণমালা আর স্বদেশের মাটি
নিরন্তর জ্বলে অনির্বাণ শিখা শোকের দহন

হে স্বদেশ 'এখন দুখিনী' নও আর
চারদিকে জেগে আছে দেখো ঘুম ভাঙানো পাখিরা
নিঝুম রাত্রির শেষে ডাকে ওই সুবর্ণ সকাল
এখনো উদ্ধত ওই বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত তর্জনী।
বঙ্গবন্ধুর নামে হেসে ওঠে প্রিয় বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ
বাবুল তালুকদার

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ
উন্নত থেকে উন্নতরে রূপান্তরিত হলো
ডিজিটাল বাংলা ঘোষিত হলো
অথচ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেঁচে নেই,
পনের আগস্ট রাতে
কুচক্রি মহলের শত্রু সেনারা তাকে হত্যা করে
বঙ্গবন্ধুর ছোট্টছেলে রাসেলও নরপশুদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি
আমি মায়ের কাছে যাবো বলে কান্না করে কতনা আর্তনাদ করে
ঐ মাছুম বাচ্চাকেও রেহাই দেয়নি শকুনের দল।
তবে প্রাণে বেঁচে গেল আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
শেখ রেহানা।
কতনা ভয়ংকর দিন পার করেছে দু'বোন
এই বাংলার মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায় ঘটনার পর
মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চোখে আজও পানি ঝরছে
আকাশ-বাতাস, মাটি ও প্রকৃতি খাঁ-খাঁ করছে এখনো
হাহাকার করছে বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ ফটো ফ্রেমে
লাল সবুজের পতাকা এই বাংলার মাটিতে উড়ছে পতপত করে
কোথায় আমার বঙ্গবন্ধু
কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার শান্তির পায়রা
ছোঁবল দিয়ে দংশন করে দিলো কালো গোখরা সাপ
এ বাংলা জুড়ে আজও গোখরা সাপের আস্তানা
ঘুরে বেড়ায় আশপাশে দিনরাত প্রতিদিন
রহমতের ছায়াতলে দু'বোনের বসবাস
হে আল্লাহ! আমার এই দু'বোনকে বাঁচাও
তুমি মহান, তুমি শ্রেষ্ঠ, রক্ষা করো এদের
প্রাণে বাঁচাও তোমার রহমতের ছাঁয়া দিয়ে।

কবিতায় গল্পে মুজিব

খান চমন-ই-এলাহি

নক্ষত্র ভরা রাত কিংবা নিমগ্ন জোছনায়
একা, একটি শব্দহীন দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের শাখে
একটি পাখি-স্তন্যপায়ী প্রাণী উড়ে এসে বসে
জীবনের গল্প খোঁজে
স্মৃতি হাতড়িয়ে সে ফিরে পায় বাংলাদেশ
পতাকা সম মর্যাদায় শেখ মুজিবুর রহমান।
নস্টালজিয়া ভর করে
স্বামী-সন্তান-সংসারি আয়নায় দেখে
কোলকাতা, নোয়াখালি, পাঞ্জাবে ধর্মীয় গোষ্ঠীগত রায়ট-দাঙ্গা
মানুষ মানুষের রক্ত চুষে নেয়ার বর্বরতা
নারীর সম্ভ্রম হানি, বিভৎসতা
সম্পদ লুটের বৈশাখী তাণ্ডব
করাচি-লাহোর পতাকা ওড়ে-সোহরাওয়ার্দী নেই
দিল্লিতে পতাকা ওড়ে-মহাত্মা গান্ধী নেই
অথচ দেশভাগ-দ্বিজাতি তত্ত্ব-দুটি দেশ
এবং মধ্য আগস্ট উনিশশ সাত চল্লিশ
বৃটিশ রাজত্বের শেষ-স্বাধীনতা শুরু
অমরত্বের ইতিহাস শুরু-ভারত ও পাকিস্তানের।
পাখিটির সাথে পৃথিবীর অসংখ্য নদী
প্রবাহমান জলের স্রোতে শোনে
আমার বাংলায় বড় হওয়া মানুষের গল্প
তারা শোনে আর ঢেউয়ের তরঙ্গ-গানে
নৃত্যের মুদ্রায়, ছবির রঙতুলি-ক্যানভাসে
নদীদের নদী মধুমতি-বাইগা আঁকে
চিত্রে শোভা পায়-
নিসর্গমায়া দেউল গাঁও-টুঙ্গিপাড়া।
কবিতার মতো বলিষ্ঠ সে পুরুষ
কীসের উপমা ব্যাঘ্র-সিংহের সাথে?
তাঁর তুলনা যায় না এই বাংলায়
হাজার বছরে জন্ম নেয়া কোনো পুরুষের সাথেই।
তিনি ছন্দের মতো দুলে দুলে ফুলে ফুলে
বড় হয়ে ওঠেন লুৎফর-সায়েরা দম্পতি ঘরে।

আমার পিতার নাম শেখ মুজিব

মিজানুর রহমান মিথুন

আমি ‘বাংলাদেশ’
আমার নাম ‘বাংলাদেশ’।
আমার পিতার নাম ‘শেখ মুজিব’।
আমার বর্তমান ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২ নম্বর।
টুঙ্গিপাড়া আমার পিতা জন্মেছিলেন আমার নাম ‘বাংলাদেশ’ রাখবেন বলে।
তোমরা কী আমার পিতাকে চিনতে পেরেছো!!
অবশ্য চিনতে পারার কথা নয়, কারণ তোমরা তো কৃতঘ্ন।
আজ ১৫ আগস্ট
আমার পিতার পুনর্জন্ম দিবস।
আজ আমি আমার পিতার পরিচয় দিতে এসেছি।
আমার পিতার নাম ‘শেখ মুজিব’।
আমি ‘বাংলাদেশ’
আমার নাম ‘বাংলাদেশ’।
তোমরা কী আমার পিতাকে চিনতে পেরেছো!!
হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি রাষ্ট্র পিতা ‘শেখ মুজিব’।
আমি ‘বাংলাদেশ’
আমার নাম ‘বাংলাদেশ’।
আমার পিতা তোমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরণ হায়েনার সাথে লড়ছেন।
মৃত্যুকে দুপায়ে ঠেলে বুলেটের মুখে বুক পেতেছেন বারংবার।
অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ তিনি তুচ্ছ মনে করেছেন শুধু তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবেন বলে।
তাই তো বছরের পর বছর সয়েছেন অবর্ণনীয় কারা নির্যাতন।
কিন্তু সর্বংসহা আমার সেই পিতাকে তোমরা খুন করেছো ১৫ আগস্টের ভোর রাতে।
তাই তো আমি কাঁদি। অঝোরে কাঁদবো শত সহস্র বছর।
কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসো না।
কারণ আমি শেখ মুজিবের প্রকৃত সন্তান।
তার আসল উত্তরসূরি।
আমি ‘বাংলাদেশ’।
আমার নাম ‘বাংলাদেশ’।
আমি পিতাহারা এক হতভাগ্য সন্তান।

তিনিই জাতির জনক

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

গোপালগঞ্জের মধুমতির তীরে
ফুলফোটা ও পাখিডাকা নীড়ে
জন্মেছিলেন খোকনসোনা শেখ মুজিবুর নামে
সবার প্রিয় টুঙ্গিপাড়া গ্রামে।

এই ছেলেটিই বড় হয়ে
নেতা হবে
সারা জাতির বন্ধু হবে
পরাধীন দেশ
করবে স্বাধীন
ভেবেছিল কেউ কি কোনোদিন?

তিনিই দিলেন একাত্তরে
হানাদারদের ধমক
মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এনে স্বাধীনতা
তিনিই দিলেন চমক
স্বাধীন বাংলার স্থপতি তাই
তিনিই জাতির জনক।

বঙ্গবন্ধু
আবুল হোসেন আজাদ

বিষন্ন ভোর সাঁতরে এ কোন সকাল
সুর্যালোকের রশ্মি অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার
আপামর জনতা বাকরূদ্ধ হতবিহ্বল যন্ত্রণায় অস্থির
চোখ অশ্রুসজল বেদনার্ত কালিমালিপ্ত মুখচ্ছবি
বঙ্গবন্ধু নেই; অবিশ্বাস বাতাসের ইথারে এলো খবর।

শোকার্ত ফুলকলিরা পাঁপড়ি মেলল না
ছড়ালো না সৌরভ; পাখিরা সুর মুর্চ্ছনায় ভাঙালো না
ভোরের সৌম্য নিস্তব্ধতার ঘুম
প্রজাপতি ডানা ভাসালো না ফুলে ফুলে
মানুষরূপী হিংস্র হায়নার ক্রুর আঘাতে।

বঙ্গবন্ধুর- 'কি চাস তোরা' দৃঢ়দৃপ্ত বজ্রকণ্ঠ
থেমে গেল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে রক্তে রক্তে
বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা
শহীদ হলেন পঁচাত্তরের পনর আগষ্ট ভোর রাতে
গোটা জাতি শোকে মুহ্যমান প্রিয় হারায়।

ওরা চেয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে
বাংলার জমিন থেকে চিরতরে বনবাসে পাঠাতে
সে কি সম্ভব? কৃতজ্ঞ জাতি ভুলিনি-
ভুলিনি তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস
তিনি আছেন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে
ফুল পাখি নদী ঝর্ণা সাগরে পাহাড়ে
আকাশে বাতাসে এদেশের প্রতিটি ধুলিকণায়।

বত্রিশ নম্বর

শফিক তালুকদার

রক্তের সিঁড়ি বেয়ে,
সেই বাড়িতে দাঁড়িয়ে,
এদিক ওদিক তাকিয়ে
বুঝে গিয়েছি যে,
ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর,
অমর অবিনশ্বর।
রবে হয়ে কালের সাক্ষী
এই অসমাপ্ত কাহিনী
অসমাপ্ত আত্মজীবনী।
হাজার বছরের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালী
নিপীগিত শোষিত মানুষের কাণ্ডারী,
জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধাচারী
স্বৈরাচারীর হৃৎকম্পন সৃষ্টিকারী
সাত মার্চের যুগান্তকারী
ঐতিহাসিক ভাষণ দানকারী
জেলে জুলুম উপেক্ষা করি,
আয়েশী জীবন ত্যাগী
ত্যাগের মহিমায় ছড়িয়ে দ্বীপ্তি,
স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা।
একদল উচ্চাভিলাসী সেনা কর্মকর্তা
পেয়ে পরাজিত শক্তির সহযোগিতা,
জাতির পিতাকে করে
সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা।
ইতিহাসে এমন জঘন্য ঘটনা
এর আগে কখনও ঘটেনি।
এই নরপশুদের নারকীয়
তাণ্ডব থেকে নিষ্পাপ শিশু
রাসেলও রেহাই পায়নি,
বাদ যায়নি সন্তান সম্ভবা বধু,
এই নির্মম ইতিহাস বাঙ্গালী
ভুলবেনা কভু।
এ রকম নৃশংস ঘটনা নির্মম বর্বরতা
এর আগে কখনো দেখেনি বিশ্ববাসী।
আগস্ট এলেই শোকে মুহ্যমান দেশবাসী
বুক ভরা ভালবাসায়,
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।
বত্রিশ নম্বরের সেই দরজায় দাঁড়িয়ে
ব্যথিত হৃদয়ে এক পাহাড় সম চাপাকান্না
বাঁধ মানে না।
কেবলই মনে হয়,
এ দিনটি বাঙ্গালীর জীবনে
না এলে হতো না?
এ বর্বর পৈশাচিক ঘটনা,
কোন জাতি মেনে নিতে পারে না।
সত্য মুছে ফেলা যায় না,
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না
ইনডেমেনিটি দিয়ে পার পাওয়া যায় না।
দেরীতে হলেও বাংলার মানুষ
দোষীদের বিচার দেখে,
ছেড়েছে স্বস্থির নিঃশ্বাস।
বত্রিশ নম্বর,
চির উজ্জ্বল ভাস্কর,
নহে নশ্বর।
ইতিহাসের জ্বলন্ত স্বাক্ষর,
রবে অমর অক্ষয়,
ইতিহাস কথা কয়।
বঙ্গবন্ধু রবে বাঙালীর হৃদয়ে
শ্রদ্ধায় ভালবাসায় অমর অবিনশ্বর,
হয়ে অনুপ্রেরণা কোটি বাঙ্গালীর।

ন্যাশন ৫৭০

মনি হায়দার

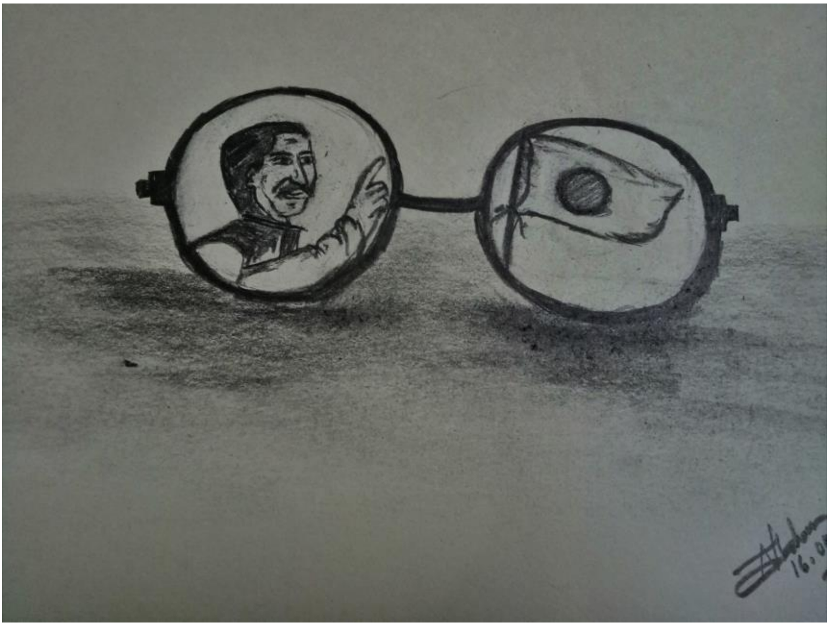

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর পারে নৌকাটা ভেড়ায় মাঝি। মাথার উপর লাল সবুজ নীল হলদে রঙের কাপড়ের বাদাম। বাতাসে বাদাম বিপুল বিক্রমে ফুলে উঠছে। মাঝি নৌকা সামলানোর চেষ্টা করছে। নদীর ঢেউ আর বাতাসের বেগে নৌকা দুলছে প্রবল। আবার নামছে মূষলধারায় বৃষ্টি। নৌকা তীরের শক্ত মাটিতে ঠেকছে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। বৃষ্টি, প্রবল বাতাসের মধ্যে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নামে আগন্তুক। শক্ত সামর্থ্য শরীর। বলিষ্ঠ বাম হাতে তীক্ষ্ণ বর্ষা। মাথায় বর্ষাতি। ডান হাতে কাচে ঘেরা আলোর আঁধার। নৌকা থেকে নেমে নৌকার দিকে ফিরে দাঁড়ায় আগন্তুক।

হরিবোল?

কন বাবাজী।

আমি না আসা পর্যন্ত এইখানে থাকবি। নৌকায় রান্না করবি। খাবি, ঘুমাবি।

হরিবোল চীৎকার করে, আপনে কবে আসবেন?

আমি বলতে পারি না, কবে আসবো। কিন্তু আমি যখনই আসি, তোরে এখানে যেন পাই। তোকে না পেলে, আমি আর দেশে ফিরে যেতে পারবো না। বৃষ্টিতে নেমে আসা মাথার পানি মুছতে মুছতে জবাব দেয় হরিবোল, আইচ্চা।

আগন্তুক বর্ষার মধ্যে পা ফেলে যাত্রা শুরু করলো। ঘন অন্ধকারের কারণে বোঝা যাচ্ছে না, এখন রাত না দিন। আগন্তুক, যখন যাত্রা শুরু করেছিল, দুদিন আগে, তখন আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। দরিয়া ছিল শুনসান। কিন্তু একটা দিন যেতে না যেতেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। বইতে শুরু করে উজানের বাতাস। নদীর পানি হেসে ওঠে ভয়ংকরভাবে। একটা নৌকার হাল ধরে রাখতে পারছিল না হরিবোল। হরিবোলকে সাহায্য করে আগন্তুক। দাঁড় টানতে শুরু করে। দুই দিন দুই রাত ঝড় আর তরঙ্গে সঙ্গে লড়াই করে, নৌকা এসে ভেড়ে কূলে। আর মাত্র চারদিন হাতে আছে আগন্তুকের। যেভাবেই হোক, কাংখিত দ্রব্য নিয়ে ফিরে যেতে হবে, নিজের এলাকায়। প্রিয় জায়া মারা গেছেন। তার শেষ অভিলাষ অবশ্যই পূরণ করবে, আমাদের গল্পের নায়ক, আগন্তুক। স্ত্রী জাহ্নবীকে ভীষণ ভালোবাসে আগন্তুক। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রিয় স্ত্রী জীবন বিসর্জন দিয়েছে। পুত্রসন্তান প্রাপক দাদীর কাছে। জাহ্নবীকে কঠিন হিম ঘরে রাখা হয়েছে। আগন্তুক যখন জাহ্নবীর শেষ প্রার্থনার দ্রব্যটি নিয়ে যেতে পারবে, তখনই হিম ঘর থেকে বের করে গোসল করানো হবে দ্রাক্ষারসে।

আগন্তুক ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ভিজতে ভিজতে আগন্তুক এসে দাঁড়ায় বিলের সামনে। চারদিকে থৈ থৈ পানি। যতদূরে চোখ যায়, পানি পানি আর পানি। হতম্ভব আগন্তুক বিলের পারে দাঁড়িয়ে ভাবে, চলে যাবো? কেমন করে পার হবো এই বিল? কিন্তু আমার স্ত্রী জাহ্নবীর শেষ মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারবো না? না, আমাকে পারতেই হবে। আগন্তুক বিলের পার ধরে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। বৃষ্টি কমে আসছে কিন্তু পড়ছে। বৃষ্টি মেখে মেখে আগন্তুক হাঁটতে হাঁটতে থাকে। অনেক দূর হাঁটার পরে আগন্তুক একটা ভেলা ভাসতে দেখে বিলে। বিলে ঝাঁপিয়ে পরে সাঁতার কাটতে শুরু করে। সাঁতার কেটে ভেলায় উঠে পায় একটা লগি। লগি হাতে আগন্তুক ভেলা সামনের দিকে ঠেলতে শুরু করে। পানি কেটে কেটে ভেলা এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বেলা যখন পশ্চিমের আকাশে হেলে পরেছে, বৃষ্টি একেবারে নেই। ডুবে যাওয়ার আগে সূর্য দিনের শেষ আলোর চিহ্ন রেখে যায়। ক্লান্ত আগন্তুক আলোর ধারা দেখে খুশি। দূরের দৃষ্টিতে একটা গ্রামের আবছা ছায়াও দেখতে পায় আগন্তুক। তার

ভেতরটা চনমন করে ওঠে। তাহলে, এসে গেছি লোকালয়ে। লোকালয়ে গেলেই আমার প্রিয় স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি পেয়ে যাবো। আগন্তুক কপালে মুছে থাকা ঘাম মুছে দ্বিগুন উৎসাহে, লগি মারতে থাকে। সূর্যের শেষ রশ্মিও মিলিয়ে যায়, আগন্তুক ভেলা ভেড়ায় তীরে।

ভেলা মাটি স্পর্শ করতে না করতেই আগন্তুক লাফ দিয়ে মাটিতে ওঠে। উঠেই আগন্তুক সামনে তাকায়। একটু দূরে কয়েকটা ছোট ছোট কুটির দেখতে পাচ্ছে আগন্তুক। মুখে হাসি, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ..। দৌড় শুরু করে আগন্তুক। দৌড়ে কুটিরের কাছে যায়। কয়েকটা কুটিরে মিট মিট আলো জ্বলতে শুরু করেছে। ভিজে শরীর নিয়ে আগন্তুক একটা কুটিরের সামনে দাঁড়ায়, ভাই?

কুটির নয়, আসলে এগুলো ক্ষুদ্র দোকান। দোকানদার পুঁথি পাঠ করছিল। ভাই শব্দে চোখে শক্ত পাওয়ারের খুলে তাকায় দোকানদার, বলেন।

আপনার দোকানে সুবাসিত সাবান আছে?

সুবাসিত সাবান?

হ্যাঁ। সুবাসিত সাবান।

আছে।

আগন্তুকের চোখে মুখে স্বস্থির আলো, দিন আমাকে একটা সুবাসিত সাবান দিন।

দোকনদার তাকের উপর হাত দিয়ে একটা সাবান আগন্তুকের হাতে দেয়, নিন।

আগন্তুক সাবান হাতে নিয়ে অবাক. এইটা সুবাসিত সাবান?

মাথা নাড়ায় দোকানদার, জি।

না, আমি এই সাবানের চেয়েও ভালো সাবান চাই।

আমার কাছে নেই, দোকানদার সাফ জানিয়ে দেয়।

সাবান রেখে আগন্তুক তাকায় অন্যান্য দোকানের দিকে, দেখি। ওইসব দোকানে আছে কি না! এগিয়ে যায় আগন্তুক। একে একে সবকটি দোকানে যায় আগন্তুক। প্রত্যেক দোকানে দোকানে ঘুরে, সবাই একই সাবান দেখায়। বিস্মিত আগন্তুক, এ কোন দেশে এলাম? এক দোকানদারের কাছ থেকে এক জগ পানি পান করে, আমি আরও উন্নতমানের সুবাসিত সাবান চাই। কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

আপনি গনজে যেতে পারেন।

গনজ কোথায়?

এখান থেকে আশি ক্রোশ দূরে।

আশি ক্রোশ দূরে? কিভাবে যাওয়া যায়?

ওই যে দূরে দেখতেছেন কাঁপা কাঁপা আলো, ওইটা গরুর গাড়ির আলো। সামনের রাস্তা ধরে গরুর গাড়ি যাইতেছে গনজে। আপনি ওই গাড়িতে যেতে পারেন।

আগন্তুক দৌড়ে বড় রাস্তায় আসে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় শব্দে কিছুক্ষণ আগে একটা গরুর গাড়ি চলে যায়। আগন্তুক পরের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে। রাত ক্রমশ বাড়ছে। মশা আক্রমণ করছে। চটাশ শব্দে মশা মারছে। মশা মারতে মারতে একটা গরুর গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়।

গনজে যাবেন? গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ যাবো। আগন্তুক দ্রুত গরুর গাড়িতে উঠে বসে।

হেই হঠ হঠ..গাড়োয়ান গরুর পিঠে আঘাত করে। গরুর গাড়িতে আবার শব্দ ওঠে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ, ক্যাঁচড়। শেষ রাতের দিকে গরুর গাড়ি গনজে পৌঁছুলে আগন্তুক ভাড়া মিটিয়ে একটা হোটেলে ঢোকে। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে আগন্তুক আগ্রহের সঙ্গে গনজের এক লোককে জিজ্ঞেস করে, ভাই বড় মুদী মনোহারী দোকান কোন দিকে?

ওই যে সামনের দিকে গিয়ে ডানের রাস্তায় প্রবেশ করলেই মুদী মনোহারীর বড় বড় দোকান পাবেন।

ধন্যবাদ আপনাকে, আগন্তুক দ্রুত সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। হেঁটে ডানের রাস্তায় ঢুকেই দেখতে পায় সারি সারি মুদী মনোহারী দোকান। হাসি ফোটে আগন্তুকের মুখে। ভাবেন, এতো সুন্দর পরিপাটি সাজানো দোকানে আমার কাঙ্ক্ষিত সুবাসিত সাবান অবশ্যই পাবো এবং আমার প্রিয়তম মানুষটির শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে সক্ষম হবো। দিনটা ভারী সুন্দর। বৃষ্টি নেই। আকাশটা পদ্মপুকুরের পানির মতো ঝকমক করছে। আগন্তুক একটা কাচের দরজা ঠেলে একটা দোকানে প্রবেশ করেন। সুবেশী বিক্রেতা স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি প্রয়োজন আপনার?

সাবান। সুবাসিত সাবান।

সুবাসিত সাবান! আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এখনই দিচ্ছি। বিক্রেতা সারিবদ্ধ সাজানো দ্রব্যাদির মধ্যে থেকে সুদৃশ্য একটি প্যাকেট এনে আগন্তুকের হাতে দেয়, নিন।

আগন্তুক পরম আগ্রহের সঙ্গে সুদৃশ্য প্যাকেটটি খোলে এবং খুলেই হতাশায় বিক্রেতার দিকে তাকায়, এই সাবানতো আমি গ্রাম এলাকায় পেয়েছিলাম। এই সাবান নয়, আমি চাই এমন একটি সাবান, যে সাবান সুবাসিত গন্ধে আমোদিত।

আমাদের গনজে আমরা একটা এই সাবানই বিক্রি করি, জানায় বিক্রেতা।

আর কোনো সাবান বিক্রি করে না এই গনজ?

মাথা নাড়ায় বিক্রেতা, জি। আপনি ঠিকই বলেছেন। সারা গনজে আপনি মাত্র এই একটা সাবানই পাবেন। আর কোনো সাবান পাবেন না।

অসহিষ্ণু আগন্তুক বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ায়, এতো পরিশ্রম করার পরও আমি আমার প্রিয়তম মানুষটির শেষ অভিপ্রায় অনুযায়ী একটা সাবান সংগ্রহ করতে পারবো না!

আগন্তুকের বিষন্ন মুখ আর আর্ত হাহাকারে বিচলিত বিক্রেতা দয়ার্তবোধ করে, আপনি আমাদের রাজধানী শহরে যেতে পারেন। সেখানে দূর বৈদেশ থেকে অনেক মানুষ আসে। আসে অনেক সওদাগর। আমার মনে হয়, আপনার কাঙ্ক্ষিত সাবান আপনি রাজধানী শহরে পেয়ে যাবেন।

আপনি সত্যি বলছেন? অকূল দরিয়ায় ডুবে যেতে যেতে যেনো আগন্তুক একটি ভরসার খড় পেয়ে যায়।

আমি অনুমান করে বলছি। রাজধানী শহরে গেলে আপনি সুবাসিত সাবান পেয়েও যেতে পারেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন একটি সুবাসিত সাবানের জন্য। অথচ পাচ্ছেন না। আমি আপনার কষ্ট অনুভব করেই বলছি, রাজধানী শহরে গেলে হয়তো আপনি সাবানটা পেয়ে যেতে পারেন।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি কিভাবে যাবো?

আমাদের এই গনজের উপকণ্ঠ থেকে ঘোড়ায় টানা শকট যায়। অব্‌শ্য এখান থেকে রাজধানী অনেক দূর। প্রায় এক হাজার ক্রোশ। যেতে যেতে আপনার দিন তিন রাত লেগে যাবে।

লাগুক, আমি যাবো। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ একটা পথ বাতলে দেয়ার জন্য। আপনার কল্যাণ হোক–আগন্তুক সময় নষ্ট করতে চায় না।

দ্রুত হাঁটতে শুরু করে সামনের দিকে, যেখানে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়ে রাজধানী শহরের উদ্দেশে। দ্রুত হেঁটে আগন্তুক পৌঁছে যায় ঘোড়ার গাড়ি টানা স্টেশনে। রাজধানী অভিমুখে একটা গাড়িতে উঠে বসে আগন্তুক। গাড়ি চলতে শুরু করে। তিন দিন তিন রাত পার করে অশেষ কষ্ট আর বিড়ম্বনা সহ্য করে মধ্য দুপুরের পরে, বিকেলের প্রথম প্রহরে ঘোড়ার গাড়ি রাজধানী শহরে পৌঁছায়। অবসন্ন ক্লান্ত শরীরের আগন্তুক একটা সরাইখানায় ঢুকে প্রথমে গোসল সেরে, খাওয়া দাওয়া করে, তিলক মাত্র বিশ্রাম না নিয়ে রাস্তায় নামে। সারি সারি অট্টালিকার মাঝে কোনটা দোকান বোঝাই যায় না, বিশেষ করে শহরে আসা নতুনদের জন্য। অনেক হেঁটে কোনো দোকান দেখতে পায় না আগন্তুক। দোকান দেখতে না

পেয়ে আগন্তুক যখন ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে, দেখতে পায় একজন বয়স্ক নাগরিককে। বয়স্ক নাগরিককে জিজ্ঞেস করে, রাজধানী শহরের দোকানপাট কোথায় অনুগ্রহ করে আমাকে বলবেন?

আপনি নিশ্চয়ই বিদেশী?

অনেকটা তাই।

আজ সরকারী ছুটির দিন। তাই রাজধানীর সব দোকানপাট বন্ধ।

দোকানপাট বন্ধ!

আগামীকাল সকাল থেকে আবার সব পাবেন।

আগন্তুক গভীর দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, কি আর করা? একটা সুবাসিত সাবানের জন্য যখন এতোদীর্ঘ যাত্রা, এসে পৌঁছুলাম রাজধানী শহরে, নিশ্চয়ই জাহ্নবীর কাঙ্ক্ষিত সাবান কাল পাওয়া যাবে। তবুও খালিহাতে আমি ফিরে যাবো না আমার প্রিয়তম জাহ্নবীর কাছে। আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয় সরাইখানায়। সরাইখানার বিছানায় শুয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক শরীর ভেঙ্গে ঘুম আসে। সেই যে যাত্রা শুরু করেছিল, আরতো বিশ্রাম নেই। এই অবসরে এক রাতের বিশ্রাম পাওয়া গেলো। পরের দিন খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গলে আগন্তুক হাত মুখ ধুয়ে, নাস্তা সেরে আবার পথে নামে।

পথে নেমেই দেখতে পায়, সারি সারি দোকান। দ্রুত একটা মনোহরী দোকানে প্রবেশ করেই বিক্রেতার কাছে সাবান চায়। বিক্রেতা সুদৃশ্য একটা প্যাকেট এনে হাতে দেয়, নিন ।

গনজের চেয়েও উন্নতমানের একটা প্যাকেট, হাতে নিয়েই গন্ধ নেয় আগন্তুক। মিষ্টি একটা গন্ধ প্রবেশ করে নাকের ভেতরে। উৎফুল্ল আগন্তুক দ্রুত প্যাকেট খোলে এবং হাতাশার অভিব্যক্তি নিয়ে তাকায় বিক্রেতার দিকে, এটা কি দিলেন আমাকে?

কেনো, সুবাসিত সাবান?

কিন্তু সাবানের নাম ৫৭০ কেনো? আমি সেই প্রান্ত গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছি। সেই গ্রাম, গনজ আর প্রায় এক হাজার ক্রোশ পথ পারি দিয়ে রাজধানীতে এসেও একই সাবান, ৫৭০! লালচে এই সাবান তো আমি চাইনি। আমি চাই স্নিগ্ধ সুবাসিত একটা সাবান, যে সাবান মানুষ অন্তিম সময়ে ব্যবহার করে। আমার প্রেমিকা জাহ্নবীর সর্বশেষ ইচ্ছে ছিল...

কিন্তু জনাব এই দেশে এই একটাই সাবান তৈরী এবং বিক্রি হয়।

একটাই সাবান তৈরী এবং বিক্রি হয়. আগন্তুক হতবিহব্বল। এটা সম্ভব?

আপনি তো নিজেই সাক্ষী। সেই প্রান্ত গ্রাম থেকে গনজ, গনজ থেকে রাজধানীতে এলেন, কি দেখতে পেলেন?

হতাশার সঙ্গে বলে আগন্তুক, একটাই সাবান ৫৭০। কিন্তু কেনো?

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আপনি জ্ঞান বৃক্ষের কাছে যেতে পারেন। উনি আপনাকে চমৎকার বুঝিয়ে বলবেন।

জ্ঞানবৃক্ষ কে কোথায় পাবো?

ওই যে সরাইখানা দেখছেন, ওই সরাইখানার পেছনে একটা ইদারা আছে। ইদারার সঙ্গে ছোট্ট একটা কক্ষ পাবেন। সেই কক্ষে থাকেন জ্ঞানবৃক্ষ মানব। তিনিই আপনাকে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন।

আগন্তুক চললো জ্ঞানবৃক্ষের কাছে। ইদারার কাছের ছোট্ট কক্ষে সাদা চুলে আচ্ছাদিত বলিষ্ঠ গড়নের একজন মানুষ বসে বসে আপন মনে এস্রাজ বাজাচ্ছেন। দরজার সামনে আগন্তুক দাঁড়াতেই এস্রাজের উপর আঙুলের কারুকাজ বন্ধ করে বললেন, ভেতরে আসুন। ভেতরে ঢুকতেই জ্ঞানবৃক্ষ বললেন, বসুন।

আগন্তুক সামনের মোড়ার উপর বসে তাকালো জ্ঞানবৃক্ষের দিকে, তাকিয়েই অবাক। জ্ঞানবৃক্ষের চক্ষু নেই। আছে দুটি কোটর। তাহলে জ্ঞানবৃক্ষ দেখছেন কি করে?

আপনিতো ৫৭০ সাবান সম্পর্কে জানতে এসেছেন, নাহ?

জি, মাথা ঝাঁকায় আগুন্তুক।

শুনুন, আমাদের এই দেশটা প্রাচীনকাল থেকে সুজলা সুফলা শষ্য শ্যমলা। ফলে, সাত সমুদ্র তের নদী পারি দিয়ে এসেছে বিদেশের বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সেই সামাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছে আমাদের ভূমিপুত্ররা। কিন্তু বিদেশীদের আধুনিক অস্ত্র আর কূটকৌশলের কাছে বার বার হেরে গেছে ভূমিপুত্ররা। হারতে হারতে লড়াই করতে করতে যখন আমাদের মুমূর্ষ ইতিহাস, সেই সময়ে গোপালগনজের বাইগার নদী তীরে জন্ম নেয় এক রাখাল বালক। সেই বালক জীবনের প্রথম অনুভবের দিন থেকে শুরু করেন বিদ্রোহ। বিদ্রোহ করতে করতে এক সময়ে গোটা জাতি একটি বিন্দুতে, একটি কণ্ঠস্বরে, একটি শব্দ স্বাধীনতায় দীক্ষিত হলে, বিদেশী বর্বর শত্রুরা রাতের অন্ধকার প্রহরে নিরস্ত্র জনতার উপর আক্রমণ চালায়।

যেহেতু জীবনের সকল রক্তবিন্দু শ্রম ঘাম আর সাহসের চাবুক সানিয়ে স্বাধীনতায় ব্যাকুল জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেই নেতা, ফলে খুব শীঘ্রই প্রতি আক্রমণের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় বিদেশী বর্বর শত্রুরা। তিক্ত বিষাক্ত পরাজয়ের সাধ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় ওরা। ফলে, শত সহস্র বছরের ইতিহাসে বাঙালি জাতি প্রথম পায় স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন পতাকা।

নেতা শুরু করলেন চির আরদ্ধ স্বাধীন দেশকে স্বপ্নের আলোয় গড়ে তুলবার এক অসীম লড়াই। সেই লড়াইয়ের ক্ষণে পরাজিত শত্রুরা এক শ্রাবণ রাতের শেষ প্রহরে দানবীয় বর্বরতায় হত্যা করে পৈশাচিক উল্লাসে নেতাকে, তাঁর চিরপ্রণম্য স্ত্রী বেণুকে, দশম বর্ষীয় পবিত্র পুত্র রাসেলসহ আরও অনেককে। হত্যার পর নিহত জনক আগামেমনন..কে কবরে শায়িত করার আগে যে পবিত্র সাবান দিয়ে গোসল করানো হয়েছিল, সেই সাবানের নাম ৫৭০। বাঙালি জাতি সেই থেকে দুনিয়ার সব সাবান অস্বীকার করে, একমাত্র ৫৭০ সাবান ব্যবহার করে আসছে। কারণ আমরা বাঙালি জাতি মনে করি, এই সাবানের চেয়ে কোনো সাবান পবিত্র আর মানবিক হতে পারে না।

আগন্তুক দাঁড়ালেন, আমি আমার প্রেমিকার শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী এই মানবিক ও পবিত্র ৫৭০ সাবানই নিয়ে যাচ্ছি আমার দেশে।

কুর্নিশ করে বেড়িয়ে গেলো আগন্তুক দৃপ্ত পায়ে। জ্ঞানবৃক্ষ এস্রাজ বাজাতে শুরু করলেন শামসুর রাহমানের অমর কবিতাকে ধারণ করে, নিহত জনক আগামেমনন করবে শায়িত আজ...। ♦

মুজিবের মুক্তি ও একটি কাঁচামাটির হাঁড়ি

শামস সাইদ

১.

দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না বেগম মুজিব। যতই চিন্তা মুক্ত হতে চান ততই চিন্তা বাড়ে। নানা চিন্তায় ডুবে থাকেন রাতভর। বেশি চিন্তা মুজিবকে নিয়ে। মাসের পর মাস পড়ে আছেন কারাগারে। কবে মুক্তি হবে জানেন না। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মুখটা কেমন শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে। সেদিন দেখে খুব কান্না পেয়েছিল তার। সে কান্না পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। পাশে হাসিনা ছিল। ভেঙে পড়বে মেয়ে। মুজিব বলেছিলেন চিন্তা করো না, মুক্তি হবে অচিরেই। আপিল করেছি। আটকে রাখতে পারবে না।

তারপরও কেটে গেল অনেকদিন। মুক্তি হলো না। হতাশ হচ্ছেন বেগম মুজিব। ভাঙতে শুরু করেছে তার আশা। হারাতে বসেছে স্বপ্ন। সামনের দিনগুলো হয়ে উঠেছে অন্ধকার। তখন এক বিকেলে আশার প্রদ্বীপ নিয়ে এলেন আমেনা বেগম। আওয়ামী লীগ নেত্রী। তাকে বসতে দিলেন বেগম মুজিব। চা বানিয়ে আনলেন। খুলে বসলেন পানের বাটা। পান মুখে দিয়ে তুললেন, মুজিবের কথা। কামালের আব্বার স্বাস্থ্য ভালো না আপা। মুক্তি হইতাছে না। কতদিন এইভাবে থাকতে হইবে বুঝি না। আপিল করছেন। তারও কোন খবর নাই। আইয়ুব খান চায় না তার মুক্তি হউক।

আমেনা বেগম শুনছেন বেগম মুজিবের কথা। চিন্তা তারও হচ্ছে। বুকটা ভরে উঠেছে কষ্টে। এ যাত্রা অনেকদিন কারাগারে মুজিব ভাই। কম চেষ্টা করেননি মুক্তির। কিন্তু মুক্তি হচ্ছে না। একটা মামলায় জামিন হলে পাঁচটা নতুন মামলায় আটকে যান। আইয়ুব খানের আদালত থেকে মুক্ত হওয়া খুব সহজ হবে না। হঠাৎ তার মনে হলো তান্ত্রিক বাবার কথা। মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। অনেকটা আশা নিয়ে বললেন, একজন মানুষ পারেন মুজিব ভাইর মুক্তির ব্যবস্থা করতে। বিশ্বাস নাও করতে পারেন আপনি। তবু বলছি।

এ কথা শুনে ঘুরে বসলেন বেগম মুজিব। হারানো স্বপ্ন এসে বসল তার বুকে। আশার প্রদ্বীপ জ্বলে উঠল অন্ধকার দূর করে। কামালের আব্বাকে মুক্ত করতে পারে। কৌতূহলি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জানতে চাইলেন, কে পারে মুক্ত করতে?

আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা সেটা হচ্ছে কথা।

বিশ্বাস অবিশ্বাস নাই আমার। কামালের আব্বার মুক্তির জন্য সব করতে পারি আপা। আপনি বলেন। তার সঙ্গে দেখা করব। যা করতে বলবেন তাই করব। কামালের আব্বার মুক্তি হলেই হয়।

আমেনা বেগম বললেন, তান্ত্রিক বাবার কথা। এমন একজন তান্ত্রিক আছেন যিনি পারেন মুক্তির ব্যবস্থা করতে। উনি ভারতের মানুষ। এখন ঢাকায় আছেন। পুরান ঢাকায় এক ভক্তের বাড়িতে উঠেছেন। আপনি যেতে চাইলে নিয়ে যেতে পারি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বেগম মুজিবের। তান্ত্রিক মুক্ত করতে পারেন! কেমনে মুক্ত করবেন। বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আমেনা বেগম বুঝতে পারলেন বেগম মুজিবের মনের দোলাচাল। কথা ঘুরিয়ে বললেন, একবার দেখা করেন বাবার সঙ্গে। দেখা করতে তো দোষ নেই। যদি মুজিব ভাইর মুক্তি হয়।

বেগম মুজিবও ভাবলেন তাই। হ্যাঁ, যাবেন।

সন্ধ্যার খানিক আগে চলে গেলেন আমেনা বেগম। বললেন, কাল বিকেলে আসব আমি। সন্ধ্যার দিকে যাব। তৈরি হয়ে থাকবেন। দিনে ঘুমান বাবা। কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

মাথা নাড়ালেন বেগম মুজিব। তৈরি হয়ে থাকবেন।

সন্ধ্যার পরে এলেন মমিনুল হক। মুজিবের ফুফাত ভাই। বেগম মুজিব বললেন তান্ত্রিকের কথা। তোর মিঞাভাইর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন তিনি। আমেনা আপা বললেন।

মমিনুল হক খুশি হলেন। সে তো খুব ভালো কথা। মিঞাভাই অনেক দিন কারাগারে। তান্ত্রিক বাবা মুক্ত করতে পারলে যাব আমরা। পরক্ষণেই প্রশ্ন

জাগল এসব বিশ্বাস করবেন মিঞাভাই? তিনি বলবেন মুক্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ। কোনো তান্ত্রিক ফান্ত্রিক পারে না মুক্তি দিতে। বেগম মুজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওনার কাছে যাব ঠিক আছে। তবে একটা কথা ভাবি, মিঞাভাই বিশ্বাস করবেন এসব?

থেমে গেলেন বেগম মুজিব। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, রাখ তোর মিঞাভাইর কথা। তার বিশ্বাস দিয়ে কী করব। মুক্তি হলেই হয়। কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, তোর মিঞাভাইকে জানাবি না। তাহলেই তো হইল।

আচ্ছা ঠিক আছে।

শোন, দেরি করব না। কালই যাব। আমেনা আপা আসবেন। আমাদের নিয়ে যাবেন। তোরও যেতে হবে।

কখন যাবেন?

সন্ধ্যার দিকে। তান্ত্রিক বাবা নাকি দিনে ঘুমান। রাতভর জেগে থাকেন। সাধনা করেন।

কিছু বললেন না মমিনুল হক। পরদিন সন্ধ্যায় আমেনা বেগম এলেন। তার স্বামীও এসেছেন সঙ্গে। বেগম মুজিব বের হলেন মমিনুল হককে নিয়ে। হাসিনাকে বললেন, ওদের দিকে খেয়াল রাখিস। তোর আব্বার মুক্তির জন্য যাইতাছি। দেখি মুক্তি হয় কিনা।

সন্ধ্যা অনেকটা পথ হেঁটে গেছে অন্ধকারে। মসজিদ থেকে প্রার্থনা করে বের হচ্ছে মানুষ। মন্দিরে বাজছে কাসার ঘণ্টা। ধুপিকাঠির গন্ধ শেষ হয়নি তখনও। বাংলা বাজারের রাস্তায় একটা গলির মুখে থামল তাদের গাড়ি। বের হয়ে হাঁটলেন গলির ভেতরে। শেষ মাথায় গিয়ে থামলেন। একটা বাড়ির কলাপসিবল গেটে নক করলেন। কেউ একজন এসে খুলে দিল পকেট গেট। ভেতরে ঢুকলেন তারা। বাড়ির সামনে বেশ অনেকখানি আঙিনা। তার সামনে অনেক দিনের পুরনো দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা দোতলা বাড়ি। শরীরে উঠে গেছে লতাপাতা। সামনে একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ঘোলা আলো। আঙিনা পার হয়ে সিঁড়ির পথ ধরলেন। যাবেন দোতলায়। সিঁড়ি অনেকটা সরু। খাড়াও। লাইট নাই। অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে। গিরিপথের মতো দুপাশেই দেয়াল। সেসব পেড়িয়ে দোতলায় উঠে একটা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। নক করতেই ভেতর থেকে ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোক খুলে দিলেন। প্রণাম করে বললেন, বসুন।

সামনের বসার ঘরটা বেশ বড়। বাড়িটা পুরান। তবে ভেতরটা অন্যরকম। সাজানো গোছানো। ভালো লাগল বেগম মুজিবের। তারা বসলেন। ভেতর থেকে চা নিয়ে এলেন এক নারী। সাথে সেই ভদ্রলোকও। আমেনা

বেগমকে আগেই চিনেন তারা। মৃদু হেসে বললেন, একটু চা পান করুন। বাবাকে বলেছি আপনাদের আগমনের কথা।

বেগম মুজিব পরিচয় দিলেন না। চা খেয়ে পান মুখে দিলেন। তারপরও বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তান্ত্রিক বাবার দেখা তখনও পাননি। ভেতর ঘরে আছেন। হয়তো মন্ত্রটন্ত্র পাঠ করছেন। বেগম মুজিবের মনে একটা স্বপ্ন। মুক্তি যদি হয় কামালের আব্বার। বিরক্ত হলেও সেই আশা দূর করে দিয়েছে সব ক্লান্তি।

মিনিট ত্রিশের পরে বসার ঘরে পা রাখলেন তান্ত্রিক বাবা। অদ্ভুত এক ঘ্রাণে ভরে উঠল কক্ষ। সফেদ ধুতির উপরে খাদি পাঞ্জাবি। কোকড়ানো ঝাকড়া চুল। বেশ বাহারি। লম্বা দাড়িগোঁফ। পঞ্চাশের ঘর পার হয়েছে বয়স। শুভ্রময় চেহারার লাবণ্যয়ে সেসব আড়াল হয়ে গেছে। ব্যক্তিত্ব পরিষ্ফুটিত হয়েছে চলনে ও পোশাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বেগম মুজিব। আকৃষ্ট হলেন মমিনুল হকও। মন বলছে মুক্তি হতে পারে মিঞা ভাইর। সাধক পুরুষ উনি। প্রথম দর্শনেই বিশ্বাস জন্মাল তার।

আয়েশ করে পা দুটো সামনে বিছিয়ে সোফায় বসলেন তান্ত্রিক বাবা। কিছুক্ষণ ঠোঁট নেড়ে কিছু পড়লেন। তারপর মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছেন আপনারা?

আমেনা বেগম তাকালেন মমিনুল হকের দিকে। চোখের ভাষায় বলতে বললেন, তাদের আসার কারণ।

মমিনুল হক বললেন কেন এসেছেন। চোখ বন্ধ করে কপালে হাত বুলাচ্ছেন তান্ত্রিক বাবা। শুনছেন মমিনুল হকের কথা। অন্যরা চুপ করে বসে আছেন। তবে তান্ত্রিক বাবার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। শেষ শব্দটা বলে চুপ করে আছেন মমিনুল হক। অপেক্ষা করছেন তান্ত্রিক বাবার উত্তরের। চোখ তখনও আটকে আছে তার মুখে। এত সুদর্শন পুরুষ আগে দেখেননি। বেগম মুজিব নিচ্ছেন আল্লাহর নাম। তান্ত্রিক যেন ফিরিয়ে না দেন। যেন কামালের আব্বার মুক্তি হয়।

তিন মিনিট পরে চোখ খুললেন তান্ত্রিক বাবা। জ্বল জ্বল করছে তার চোখ। চেহারা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আলোর ফোয়ারা। নিচুস্বরে বললেন, শেখ মুজিব। আমি জানি শেখ মুজিবের কথা। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। মাথা তুলে বললেন, আমি যা করতে পারি সেটা খুব সহজ নয়। পারবে সে কাজ করতে? বললেন মমিনুল হকের দিকে তাকিয়ে।

দৃঢ় কণ্ঠে মমিনুল হক বললেন, পারব। মিঞাভাইর মুক্তির জন্য সব করতে পারব। যত কষ্টের হোক তা। আপনি চিন্তা করবেন না। বলুন কী করতে হবে।

মাথা নিচু করে স্থির মনে বসে আছেন তান্ত্রিক বাবা। সবাই তাকিয়ে আছেন। বেগম মুজিব আশায় বুক বাধছেন। মুক্তি হবে কামালের আব্বার। ফিরিয়ে দিচ্ছেন না তান্ত্রিক বাবা। নিরবতা ভেঙে হঠাৎ তান্ত্রিক বাবা বললেন, আমি একটা মন্ত্র দেব। সেটা মনে রাখতে হবে। ভুলে গেলে হবে না। তবে মনে রাখা সহজ না।

মমিনুল হক মাথা নাড়লেন। পারবেন মনে রাখতে। তারপর কী করতে হবে শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আঙুল নাড়াচ্ছেন তান্ত্রিক বাবা। ডান হাতে তার পাঁচটি আঙটি। পাথরের ওপর আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। এবার বললেন, শেখ সাহেবের মামলা যখন কোর্টে উঠবে, ঠিক তখন বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বিচারক নিমগ্ন থাকবেন। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ না। তবে করতে হবে। যেন বিচারকের দৃষ্টি তোমার ওপর পড়ে। না পড়লে হবে না। বিচারক যখন তোমার দিকে তাকাবেন, তখন সেই মন্ত্র পাঠ করবে।

এই গেল এক নম্বর। দ্বিতীয় যে কাজটা করতে হবে সেটা খুব কঠিন না। কিছু দ্রব্য দেব কাঁচা মাটির হাঁড়িতে রেখে মুখ বন্ধ করে। হাঁড়ির মুখ খুলে দেখা যাবে না। গভীর রাতে সম্পূর্ন নগ্ন অবস্থায় জলে নেমে হাঁড়িটা ভাসিয়ে দিতে হবে।

মমিনুল হক ঘাবড়ে গেলেন। তা কি করে সম্ভব। লজ্জাও লাগছে। তবু করতে হবে। মাথা নিচু করে বললেন, সমস্যা নাই। পারব।

অনেকক্ষণ নিচু মুখে বসে রইলেন তন্ত্রিক বাবা। কিছু একটা ভাবছেন। মুখ তুলে বললেন, এই কাজ দুটো সঠিকভাবে সম্পাদনা করতে পারলে সফলতা আসতে পারে। যদি না পারো, সে ফলাফলের সামনে আমাকে দাঁড় করাবে না। সেটা তোমার।

এরপর তাকালেন আমেনা বেগমের দিকে। কতটা বিশ্বাস হবে আপনাদের জানি না। আমি তান্ত্রিক। আমিও যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলছি না এমন নয়। তারপরও করে যাচ্ছি। শেখ সাহেবের মুক্তি হবে এমনটা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে বিশ্বাস রাখতে পারেন। হতে পারে।

আপনার কথা আমি জানি বাবা। সেজন্যই ভাবিকে নিয়ে এসেছি। যা করতে হবে আপনি করুন। অনেকদিন মুজিব ভাই কারাগারে। শরীর ভালো না তার। আইয়ুব খান মুক্তি দিবেন না।

ভেতর ঘরে গেলেন তান্ত্রিক বাবা। খানিক পরে ফিরে এলেন। মৃদু হেসে বললেন, একটা সমস্যা হয়ে গেল।

চমকে উঠলেন মমিনুল হক। সে আবার কি!

মাটির কাঁচা পাত্র নেই। মমিনুল হকের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল একবার আস তুমি। মাটির কাঁচা পাত্র নিয়ে। বাকি সব করে দেব আমি।

কিছু না ভেবে মাথা নাড়লেন মমিনুল হক। ঠিক আছে, কাল আসবেন।

তান্ত্রিক বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠলেন আমেনা বেগম। সেই পথে নেমে এলেন নিচে। বাইরে এসে বেগম মুজিব বললেন, বিশ্বাসে বস্তু মেলে, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস করে দেখি। যদি মুক্তি হয়। টাকাপয়সা তো নিতাছেন না।

অনেকখানি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিলেন আমেনা বেগম। বললাম ভাবি, আল্লাহর রহমতে মুজিব ভাইর মুক্তি হবে। কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না। দেইখেন আপনি।

মমিনুল হক করছেন অন্য চিন্তা। কাঁচা মাটির হাঁড়ি পাবেন কোথায়! বললেন, ভাবি, কাঁচা মাটির হাঁড়ি পাব কোথায়? পোড়া মাটির হলে কথা ছিল না।

সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। কাঁচা মাটির হাঁড়ি কোথায় পাবেন। কাঁচা মাটির হাঁড়ি পাওয়াটা সহজ না। খানিক ভেবে মমিনুল হক বললেন, কাল নারায়ণগঞ্জ যাব। ওদিকে পালপাড়া আছে। কাঁচামাটির হাঁড়ি পেতে পারি। তাছাড়া উপায় নাই।

আমেনা বেগমের স্বামী বললেন, হ্যাঁ, ওদিকে আছে। চেষ্টা করলে পেয়ে যাবেন। কঠিন কিছু না।

২.

সকাল সকাল বের হলেন মমিনুল হক। নারায়নগঞ্জ যাবেন। বেগম মুজিবকে বললেন, গাড়িটা নিয়ে যাই। কাঁচা মাটির হাঁড়ি বাসে আনা যাবে না। নানা প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। ভেঙেও যেতে পারে।

যা। চেষ্টা করিস। ওই হাঁড়ি না হইলে তোর মিঞাভাইর মুক্তি হবে না।

গাড়ি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে গেলেন মমিনুল হক। আওয়ামী লীগের এক নেতার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, মাটির একটা কাঁচা হাঁড়ি লাগবে ভাই।

কাঁচা হাঁড়ি দিয়ে কী করবেন?

সেকথা বলা যাবে না। তবে লাগবে। আজই লাগবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। আপনাকে বলব পরে। কাজটা হয়ে গেলে।

আওয়ামী লীগ নেতা আর প্রশ্ন করলেন না। বের হলেন মমিনুল হককে নিয়ে। গেলেন দেওভোগ। পাকা রাস্তার শেষমাথায় দাঁড় করালেন গাড়ি। সিগারেট টেনে হাঁটলেন কাঁচা মাটির পথে। শীতলক্ষ্যার পাড়ে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন পালপাড়া। এক বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, আমাদের একটা কাঁচা মাটির হাঁড়ি লাগবে। টাকা যা লাগে দেব।

কাঁচা মাটির হাঁড়ি! শুনেই সবার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায়। অন্যদিকে ঘুরায়। তারপর মাথা নাড়ে। স্বরটা পাল্টে বলে, না না, কাঁচা হাঁড়ি বিক্রি হয় না।

গলায় একটু জোর দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা বললেন, হাঁড়ি আমাদের লাগবেই।

তখন বলেন, কাঁচা হাঁড়ি আমাদের কাছে নাই।

মমিনুল হক আশা হারাচ্ছেন। চিন্তাও বাড়ছে তার। হাঁড়ি না নিয়ে বাসায় যেতে পারবেন না। এবার মুখ খুললেন তিনি। কোথায় পাব কাঁচা মাটির হাঁড়ি?

সেকথা বলতে চায় না ওরা। অস্পষ্ট শব্দ করে বলে, দেখেন, কার কাছে আছে। আমরা জানি না।

সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন মমিনুল হক। কাঁচা মাটির হাঁড়ি বেচতে চায় না কেন! আওয়ামী লীগ নেতা বললেন, এই হাঁড়ি তান্ত্রিক কাজে ব্যবহার হয়। তা পালেরা জানেন। কাঁচা হাঁড়ি বিক্রি করলে পরবর্তী হাঁড়ির পোয়ান ভালো পোড়ে না। নষ্টও হয়ে যায়।

এবার বুঝতে পারলেন মমিনুল হক। তবু আশা ছাড়লেন না। আরও কয়েক বাড়ি গেলেন। কোথাও পেলেন না। একটু সামনে গিয়ে দেখলেন একবাড়ির সামনে মাটির হাঁড়ি রোদে দিয়েছে। বেশ আনন্দ হলো। পেয়েছেন। এবার না করতে পারবে না। জোর করে হলেও একটা হাঁড়ি নিয়ে যাবেন। কোন কথায় ফিরবেন না। এক বয়স্ক লোক বসে আছেন। পাওয়ারি চশমা চোখে। শির্ণদেহ। বয়সের বাড়ে নুয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে কাশছেন। ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে। তার খানিকদূরে কয়েকজনে মাটি দিয়ে হাঁড়ি পাতিল তৈরি করছে। মমিনুল হক দাঁড়ালেন তার সামনে। বৃদ্ধ তখনও কাশছেন খক খক করে। একদলা থু থু ফেললেন ডানে মুখ ঘুরিয়ে। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা?

মমিনুল হক পাল্টা প্রশ্ন করলেন। এই হাঁড়ি আপনার?

আবার শুরু হলো বৃদ্ধের কাশ। কয়েকবার কেশে গলা জেড়ে থুথু ফেলে বললেন, হ্যাঁ, আমার।

মমিনুল হক বসলেন তার সামনে। বিনয়ের সুরে বললেন, আমি বিপদে পড়েছি কাকা।

বৃদ্ধ অবাক হলেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। তাগড়া যুবক লোকটা বিপদে পড়েছে। কি এমন বিপদটা। হাঁটু গেড়ে বসেছে তার সামনে। তিনি কি করতে পারেন। কী বিপদ আপনার? আমি কী করতে পারি? আমি পারি না চলতেও। কাশতে কাশতে নাভিশ্বাস উঠে যায়।

আপনিই পরেন আমাকে উদ্ধার করতে।

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ। কৌতূহলও বাড়ল। তিনি উদ্ধার করতে পারেন! কী এমন বিপদ। খানিক ভেবে বললেন, আমারই মাথা

তিনটা। এখন আর জীবন বইতে পারছি না। দু পা হাঁটলে চার পা জিরাতে হয়। আমি পারি আপনাকে উদ্ধার করতে। বলেন তো বিপদটা কী?

হাসি মুখে মমিনুল হক বললেন, আমার একটা মাটির হাঁড়ি লাগবে।

বৃদ্ধ অনেক সময় তাকিয়ে রইলেন। এতে বিপদের কী আছে। বিপদ খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। মাটির হাঁড়ির অভাব আছে। তার জন্য লোকটা এমন করছে কেন! মাথা নিচু করে বললেন, হাঁড়ি তো নাই। সবে বানাচ্ছি। এগুলো পোড়াতে আরও দিন পনের লেগে যাবে। না শুকালে পোড়া যায় না। আপনি অন্য কোনো বাড়িতে গেলে পেয়ে যাবেন। তেমন বিপদ না এটা।

পোড়াতে হবে না। কাঁচা মাটির হাঁড়ি হলেই হবে। কোমল স্বরে বললেন, মমিনুল হক।

অন্য দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধ। চোখে মুখে বাজ পড়ে গেল তার। মনে হচ্ছে খুব বেজার হয়েছেন। খানিক পরে গম্ভীর মুখে বললেন, কাঁচামাটির হাঁড়ি বিক্রি হয় না।

আমি জানি কাঁচামাটির হাঁড়ি বিক্রি করেন না। তবে আমাকে একটা দিতে হবে। খুব দরকার। টাকা যা লাগে দেব।

কাঁচা মাটির হাঁড়ি কেন খুঁজছেন, তা বুঝতে পারছি। তবে আপনি যত করেই বলেন দিতে পারব না। এবছর ব্যবসা ভালো না। অনেক মাল নষ্ট হয়েছে। অকাল বর্ষায় সব শেষ হয়ে গেছে। এখনও রোদ নাই। আপনার কাছে কাঁচা হাঁড়ি বিক্রি করে এই পোয়ানের মালও নষ্ট করতে পারব না বাবা। তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। এসব করে জীবন চলে না। মাটির গন্ধ ব্যাকুল করে। তাই পড়ে আছি।

অবাক চোখে তাকালেন মমিনুল হক। এসব কি বলছে। কিছুই বুঝতে পারছেন না। একটু দম নিয়ে বললেন, শোনেন, আপনি কী বুঝছেন না বুঝছেন জানি না। হাঁড়ি আমাকে একটা দিতে হবে। আমার ভাই জেল খানায়। অনেক দিন আটকে আছেন। শরীর ভালো না তার। এই একটা হাঁড়ির জন্য মুক্তি হচ্ছে না। আপনি চান আমার ভাই জেল খানায় থাকুক? আমার ভাইতো এই দেশের মানুষের জন্যই আন্দোলন করেন। মানুষের অধিকারের কথা বলেন। সেজন্যই জেল খাটেন।

স্তব্দ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। কয়েকটা কাশ দিয়ে বললেন, এসব কী বলছেন! হাঁড়ি না হলে আপনার ভাইয়ের মুক্তি হবে না।

আমি সত্য বলছি। একটা কথাও মিথ্যা না।

খানিক ঝিম মেরে থাকলেন বৃদ্ধ। এরপর মুখ তুললেন। আপনার ভাইকে চিনি না আমি। তবে একটা কথা বলি শোনেন। রাজনীতির কথা তুলেছেন সেজন্য বলছি। আমরা মাটির মানুষ। সারাদিন মাটি নিয়ে থাকি। মাটির সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম একটা জীবন। কতরূপ দিলাম মাটির। পুড়ে লাল করে ফেললাম। রাজনীতি আমরা বুঝি না। রাজদরবারের খবরও রাখি না। তবে এতটুকু জানি, এই দেশের মানুষের জন্য একজন মানুষ কথা বলেন। ভালোবাসেন। আন্দোলন করেন। জেল খাটেন। বিপদে লাফিয়ে পড়েন। তিনি হলেন শেখ মুজিব। তাছাড়া কেউ মানুষের কথা বলেন না।

আশ্চর্য হলেন মমিনুল হক। আনন্দে জল এসে গেল তার চোখে। প্রান্তিক মানুষও মিঞাভাইকে জানে। ভালোবাসে। মনে হচ্ছে এবার হাঁড়ি পাবেন। মিঞাভাইর কথা বললে না দিয়ে পারবে না। একটু ধাতস্ত হয়ে বললেন, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য একটা কাঁচামাটির হাঁড়ি দিবেন না?

মমিনুল হকের মুখের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। এ কী বলেন। শেখ মুজিবের জন্য একটা কেন? সব হাঁড়ি দিয়ে দিতে পারি।

উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে মমিনুল হক বললেন, শেখ মুজিব আমার ভাই। তার মুক্তির জন্য একটা হাঁড়ি লাগবে।

চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। শেখ মুজিব আপনার ভাই! আবারও তাকালেন মমিনুল হকের দিকে। দেখলেন গভীর দৃষ্টিতে। বললেন, আপনার সাথে তার চেহারার মিল আছে। বহু আগে একবার দেখেছি শেখ সাহেবকে নারায়ণগঞ্জে। অতটা পরিষ্কার মনে নেই। আপনাকে দেখে আবার মনে পড়ল চেহারাটা। তা সেকথা আগে বললেন না কেন? এতো কথা বলতে হতো না। শ্বাস টেনে তুলতেই কষ্ট হয়। তারপর কথা।

বৃদ্ধ দাঁড়ালেন লাঠিতে ভর করে। আসেন আমার সঙ্গে। মমিনুল হককে নিয়ে গেলন কাঁচা মাটির হাঁড়ির কাছে। দেখেন, কোনটা নিবেন আপনি। কয়টা লাগবে। শেখ সাহেবের মুক্তির জন্য একটা না। যতটা লাগে নিয়ে যান।

একটা হাঁড়ি হাতে নিলেন মমিনুল হক। এরপর হাত দিলেন পকেটে। কিছু টাকা বের করলেন। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন, কত টাকা দেব? আপনি যা বলবেন তাই দেব। আমার অনেক উপকার হয়েছে। যার মূল্য হয় না।

বৃদ্ধের চোখে এবার ক্রোধের ছাপ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কথা বললেন না। এরপর চোখের জলে কণ্ঠ ভিজিয়ে বললেন, শোনেন, শেখ মুজিব জেলে। তার মুক্তির জন্য দরকার একটা হাঁড়ি। আমাকে পয়সা দিচ্ছেন

আপনি। গরিব বলে অত লোভী নই। শেখ সাহেবের জন্য হাঁড়ি কেন! জীবনও দিতে পারি। তার মুক্তির আন্দোলনে এই হাঁড়িটা দিয়ে অংশগ্রহণ করলাম আমি।

মমিনুল হক বুঝতে পারলেন ভালোবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। ভালোবাসা না থাকলে এই হাঁড়ি পেতেন না। বৃদ্ধের কথা শুনে ঝিম দিয়ে গেল তার শরীর। এত ভালোবাসে মিঞাভাইকে। তাকে প্রণাম করলেন। বিদায় নিলেন তার কাছ থেকে।

সারাপথ ওই বৃদ্ধ পালের কথা মমিনুল হককে ভাবিয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছেই শেখ মুজিব এমন প্রিয়। এখানে না এলে বুঝতে পারতেন না। পারবে না মিঞভাইকে আটকে রাখতে। কেউ পারবে না। মুক্তি তার হবেই। যাকে মানুষ এত ভালোবাসে তাকে আটকে রাখার সাধ্য কোনো শক্তির নেই।

বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমেছে। হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন বেগম মুজিবের সামনে। হাতে তার কাঁচা মাটির হাঁড়ি। বেগম মুজিবের মুখেও হাসি। এবার মুক্তি হবে কামালের আব্বার।

মমিনুল হক বললেন, ভাবি হাঁড়ি পাওয়া খুব সহজ ছিল না। এই হাঁড়ির পেছনে গল্প আছে।

কী গল্প! শুনতে চাইলেন বেগম মুজিব।

মমিনুল হক বললেন সেই বৃদ্ধ পালের কথা। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন বেগম মুজিব। তার বুকে কোনো কষ্ট নেই। সব জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে। এরপর বললেন, তোর মিঞাভাই যেমন দেশের জন্য, মানুষের জন্য জীবন দিতে পারেন। তোর মিঞাভাইকেও মানুষ সেরকম ভালোবাসে। তারাও তার জন্য জীবন দিতে পারে। আজ মনে হচ্ছে তোর মিঞাভাই রাজনীতি করে ভুল করেন নাই ভাডি।♦

হজ্জের মুবারক সফরে আমাদের করণীয়

ড. আবদুল জলীল*

মুমিন মাত্রেরই মন কাঁদে মক্কা শরীফে অবস্থিত বায়তুল্লাহ দর্শনের জন্য। সাথে সাথে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্যও। তাই তো হজ্জে গেলেই মনে হয় ছুটে যাই হেরা পর্বত, ছাওর পর্বতের গুহায়। নবীজির পবিত্র শরীরের ছোঁয়া যেন আজো সেখানে লেগে রয়েছে। মন চায় আরাফা, মিনা, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থান প্রাণ ভরে দেখি আর সেই এক আল্লাহর সমীপে রোনাযারী করি, যিনি রহমত বরকতে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন এসব স্থান। হজ্জ মূলত এসব স্থানে বিচরণ এবং মহান আল্লাহর স্মরণ, তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হজ্জ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা। আর শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জের নির্দিষ্ট মাসসমূহে নির্দিষ্ট নিয়মে বায়তুল্লাহ শরীফ ও আরাফাতসহ নির্দিষ্ট কতগুলো স্থান যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে, যার বিবরণ পরে আসছে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধে অন্য চারটি স্তম্ভের বাস্তবায়ন ও পরিপালনের জন্য হয়তো মানুষের শুধু হৃদয় মন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। যেমন, ঈমান, সালাত (নামায), সাওম (রোযা) এগুলো আদায়ে শরীরের সুস্থতা প্রয়োজন, সম্পদের কোন প্রয়োজন হয় না। অথবা শুধু সম্পদের প্রয়োজন। যেমন, যাকাত, এ ইবাদতটি আদায়ে শরীরের কোন প্রয়োজন হয় না। আর

কেবলমাত্র হজ্জই এমন স্তম্ভ, যা পরিপালনের জন্য যুগপৎভাবে শারীরিক সুস্থতা ও সম্পদ উভয়টি প্রয়োজন। এ থেকেই হজ্জের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

হজ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হজ্জের মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুর ঊর্ধ্বে মহান আল্লাহর নির্দেশ সমুন্নত রাখা, তাওহীদকে শিরোধার্য ও একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা এবং দরাজ কণ্ঠে তার ঘোষণা প্রদান করাই মূলত এর লক্ষ্য। সর্বোপরি আল্লাহ প্রেমের সর্বোচ্চ নিদর্শন এই হজ্জের মাধ্যমে পেশ করা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক ঐক্যবদ্ধভাবে এক কণ্ঠে উচ্চস্বরে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর তাওহীদ ঘোষণা করে। আল্লাহ প্রেমের অমিয় ধারা পান করতে তারা দূর দূরান্ত থেকে সম্পদ ও আত্মীয় স্বজনদের মহব্বত ও মায়ার বন্ধন পায়ে দলে ছুটে আসে পবিত্র মক্কা ভূমিতে। সফরের শত কষ্ট তারা হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

হজ্জ একটি ফরজ আমল

পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও হজ্জের ইবাদত করা হতো; কিন্তু তার ধরন ও পদ্ধতি ছিল কিছুটা ভিন্ন। সর্বশেষ নবী হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও তাঁর উম্মতের উপর হজ্জ ফরয হয় নবম হিজরিতে। বিত্তশালী ও সামর্থ্যবানদের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “আর সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয” (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)। জীবনে একবারই মাত্র এ ইবাদত পালন করা ফরয। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘হে লোকসকল! আল্লাহ তা‘য়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন’। তখন আকরা ইবনে হাবেস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বছর? তিনি বললেন, আমি বললে প্রত্যেক বছরের জন্য ফরয হয়ে যাবে। আর যদি তা (ঐভাবে) ফরয হয়ে যায় তবে তোমরা তার উপর আমল করবে না এবং তোমরা তার উপর আমল করতে সক্ষমও হবে না। হজ্জ একবার ফরজ। যে অতিরিক্ত আদায় করবে সেটা হবে নফল”। (আবূ দাউদ হাদীস নং ১৭২১; ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৮৬)

হজ্জের ফযীলত

হজ্জ ও উমরা মহান আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয় আমল। এর বহু ফযীলত রয়েছে। নিম্নে তার কিছু ফযীলত তুলে ধরা হলো :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করেছে। সে হজ্জের মধ্যে কোনরূপ অশ্লীল আচরণ

করেনি এবং কোনরূপ গুনাহে লিপ্ত হয়নি, সে সেই নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় ফিরে আসবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছে। (বুখারী, হাদীস নং ১৫২১; মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫০)।

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "মাবরূর তথা পাপ ও কলুষমুক্ত হজ্জের পুরস্কার হলো জান্নাত। (বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৩; মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৯)

৩. হজ্জ পিছনের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) মুসলমান হবার পূর্বে যখন তার পূর্বের গুনাহ মাফ হবার শর্তারোপ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছিলেন, "তুমি কি জাননা হে আমর! ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়; হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয় এবং হজ্জ তার পূর্বের সকল গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়"। (মুসলিম, হাদীস নং ১২১)

৪. পাপ মোচনের পাশাপাশি হজ্জ-উমরা তা সম্পাদনকারীর অভাব অনটনও দূর করে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর করতে থাকো। কেননা তা অভাব অনটন ও গুনাহ দূর করে দেয় যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লাকে"। (তিরমিযী, হাদিস নং ৮১০; নাসাঈ, হাদীস নং ২৬৩০)

৫. হজ্জ ও উমরা পালনকারিগণকে আল্লাহর মেহমানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের দু'আ কবুলের কথাও বলা হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আল্লাহর পথে যুদ্ধে বিজয়ী (গাজী), হজ্জ পালনকারী ও উমরা পালনকারী আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। আল্লাহ তাদেরকে ডেকেছেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর তারা তাঁর কাছে চেয়েছে। তাই তিনি তাদেরকে দিয়েছেন" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯৩; ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৪৬১৩)। অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হজ্জ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর মেহমান বা প্রতিনিধি। তারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা তাঁর কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন। (ইব্ন মাজাহ, হাদীস নং ২৮৯২)

৬. বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হলে প্রতি কদমে নেকী লেখা হয়, গুনাহ মাফ করা হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি যখন বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে আপন ঘর থেকে বের হবে তখন তোমার উটের প্রত্যেকবার পা রাখা এবং পা তোলার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার জন্য একটি করে নেকি লিখবেন, তোমার একটি করে

গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদীস নং ১১১২)

পক্ষান্তরে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তা আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তার প্রতি কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার কোন প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, অত্যাচারী শাসক যার পথ রোধ করে রাখে না অথবা কোন রোগ তাকে আটকে রাখেনি, এতদসত্ত্বেও যদি সে হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে চাইলে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক। (সুনানে দারেমী)

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো :

১. মুসলমান হওয়া। কাফির মুশরিকদের বায়তুল্লাহর হজ্জ তো দূরের কথা তাদের সেখানে যাওয়াও নিষেধ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো নাপাক। সুতরাং তারা যেন তাদের এ বছরের পরে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। (সূরা তাওবা : ২৮)

২. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া। পাগলের উপর হজ্জ ফরজ নয়। কারণ সে ইসলামের বিধিবিধান জানা এবং আল্লাহর আদেশ বুঝার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “শিশু, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয় (ইব্‌ন মাজাহ, হাদীস নং ২০৪২)। অর্থাৎ তাদেরকে জবাবদিহি করা হবে না

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

৪. স্বাধীন হওয়া

৫.মক্কায় যাতায়াত এবং সেখানে অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা। এ ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদ হলো, “সমার্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরজ করেছেন” (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)।

৬. পথ নিরাপদ থাকা অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তা হুমকিতে না থাকা

৭. হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ ও অন্যান্য প্রয়জনীয় খরচের ব্যবস্থা থাকা

৮. মহিলাদের জন্য ‘মাহরাম’ পুরুষ সাথে থাকা। মাহরাম অর্থ স্বামী অথবা এমন কোন আত্মীয় যার সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ হারাম। যে মহিলার মাহরাম নেই, তার উপর হজ্জ ফরজ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “কোন মহিলা যেন ‘মাহরাম’ ছাড়া সফর না করে। আর কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে মাহরাম থাকা ছাড়া তার সাথে না যায়। তখন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি ওমুক ওমুক যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এদিকে আমার স্ত্রী হজ্জ করার ইচ্ছা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও"। (বুখারী, হাদীস নং: ১৮৬২)

অন্য হাদীসে আছে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "কোন মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া কখনো হজ্জ না করে"। (দারাকুতনী, হাদীস নং , ২৪৪০)

হজ্জের করণীয়

মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে নিয়ত করে হজ্জের কার্যক্রম শুরু করতে হয়। ইহরাম বাঁধা ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নয়। উল্লেখ্য যে, মীকাত শব্দের অর্থ নির্ধারিত সীমারেখা। হজ্জ বা উমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা যায় না সেটাই মীকাত। মহান আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেসব বিষয়ের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন, যথার্থভাবে সেগুলোর সম্মান প্রদর্শন করা ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত এবং কল্যাণ লাভের পথ। ইরশাদ রয়েছে : "কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে সেটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত" (সূরা হজ্জ : ৩২)। সুতরাং মহান আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন বায়তুল্লাহর সম্মানার্থে বেশ কিছুদূর থেকে ইহরাম বেঁধে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে বায়তুল্লাহ পানে ছুটে যাবার জন্য হজ্জ বা উমরার মীকাতসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোকদের জন্য ৫টি মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. যুল হুলায়ফা : বর্তমান নাম 'বিরে আলী' বা 'আবারে আলী'। এটি মদীনাবাসীদের মীকাত। মক্কার পথে মদীনার মসজিদে নববী থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মক্কা থেকে ৪২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। নবী কারীম (সা) বিদায় হজ্জের সময় এখান থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন।

২. যাতু ইরক : বর্তমানে একে 'দারীবাহ'ও বলা হয়। মক্কা থেকে পূর্ব দিকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি প্রাচ্যবাসী তথা ইরাক, ইরান এবং এদিক থেকে আগত এর পরবর্তী দেশগুলির অধিবাসীদের মীকাত। বর্তমানে এ মীকাতটি পরিত্যাক্ত। এ পথে বর্তমানে কোন রাস্তা নেই। স্থলপথে আসা পূর্বাঞ্চলীয় হাজীগণ বর্তমান 'আস-সাইলুল কাবীর' অথবা 'যুল হুলাইফা' থেকে ইহরাম বাঁধেন।

৩. কারনুল মানাযেল : এটি বর্তমানে 'আস-সাইলুল কাবীর' নামেও পরিচিত। নাজদ, রিয়াদ, মানফূহা ও তায়েফবাসী এবং এদিক থেকে আগত

লোকদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৪. আল-জুহফা : মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১৮৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি 'রাবেগ' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি নিশ্চিহ্ন জনপদ। এটি সিরিয়া, মিসর ও মরক্কোবাসীদের মীকাত। তবে আল-জুহফার নিদর্শনাবলী বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে লোকেরা মক্কা থেকে ২০৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'রাবেগ' নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধে।

৫. ইয়ালামলাম : বর্তমানে যা সাদিয়া নামেও পরিচিত। এটি ইয়ামান ও এ পথে আগত লোকদের জন্য এবং ভারত পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য থেকে আগত লোকদের জন্য মীকাত। মক্কা থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে ৬০ মাইল বা ১২৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ইহরাম বাঁধার পূর্বে করণীয়

মনে রাখতে হবে হাজী সাহেব আল্লাহর সামনে হাযির হতে যাচ্ছেন। তাঁর শাহী দরবারে হাজিরা দিতে যাচ্ছেন। তাই যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে। সেজন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে কিছু কাজ করতে হয় সেগুলি সুন্নাত। যেমন :

১. নখ কাটা, গোফ ছাঁটা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা। মাথার চুল না কেটে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিতে হবে। এটাই সুন্নাত।

২. গোসল করা। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরামের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পাল্টিয়েছেন এবং গোসল করেছেন (তিরমিযী, হাদিস নং ৮৩০)। পুরুষ মহিলা সবার জন্য এটা সুন্নাত। এমনকি মহিলারা হায়েয বা নেফাসগ্রস্ত হলেও। তবে গোসল করা সম্ভব না হলে উযু করে নিবে। উযু-গোসল কোনটাই সম্ভব না হলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে তায়াম্মুম করবে না।

৩. ইহরাম বাঁধার পূর্বে মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যাবহার করা। তবে ইহরাম বাঁধার পর তা করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ইহরাম বাঁধার পরে শরীরের যে কোন অংশে পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির প্রভাব থেকে গেলেও কোন সমস্যা নেই। তবে ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই।

৪. সেলাই বিহীন সাদা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পায়ে দেয়া। মহিলারা স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবে। তবে তা শালীন ও ঢিলেঢালা হতে হবে, যাতে পর্দা বজায় থাকে। ইহরাম অবস্থায় নেকাব বা অনুরূপ কিছু দিয়ে সর্বক্ষণ চেহারা ঢেকে রাখা তাদের জন্য জায়েয নেই। তবে মাথার উপর দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করবে।

৫. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সালাত আদায় করবে। যদি কোন সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে সে উক্ত ওয়াক্তের সালাত আদায়ের পর ইহরাম বাঁধবে। অথবা দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল উযু বা অন্য কোন নফল সালাত আদায় করে ইহরাম বাঁধবে।

৬. হজ্জ ও উমরার নিয়ত করার পরে এবং ইহরাম বাঁধার পর থেকে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া যত বেশি পাঠ করবে তত বেশি সওয়াব হবে। তালবিয়া হলো 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক'। অর্থ আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রসংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমার, তোমার কোন শরীক নেই। মহিলারা নিজেরা শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে তালবিয়া পড়বে।

হজ্জের ফরজসমূহ

হজ্জের ফরজ তিনটি। যথা, ১. ইহরাম বাঁধা। ২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। অল্পসময়ের জন্য হলেও। সুন্নত হলো জোহর আসরের সালাত সেখানে আদায় করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে আবস্থান করে মাগরিব না পড়েই মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়া। ৩. তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা করা, যা ১০ যিলহজ্জ কুরবানী করার পর থেকে ১২ তারিখের মধ্যে যে কোন সময় করতে হবে। এর মধ্যে এটি আদায় না করতে পারলে তার হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

নিম্নোক্ত বিধানগুলো পালন জরুরী। কোনটি করতে না পারলে অথবা ক্রমধারার ওলট পালট হলে দম তথা একটি পশু কুরবানী দিতে হবে। হজ্জের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ :

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করা এবং সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ করা। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হযরত হাজেরা (আ)-এর স্মৃতি জাগরুক রাখার জন্য এ বিধান। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহর নির্দেশে শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তার মা হাজেরা (আ)-কে এক মশক পানি ও কিছু খেজুর দিয়ে বর্তমান জমজম কূপের কাছে রেখে যান। খাবার ও পানি শেষ হয়ে গেলে মায়ের বুকের দুধও শেষ হয়ে যায়। ফলে শিশু ইসমাঈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হাত-পা ছুড়ছিলেন। ধুধু মরুভূমিতে কোথাও খাবার বা পানি পাওয়া যাবে না। তাই কোন কাফেলাকে পাওয়া গেলে তাদের কাছে খাবার বা পানি পাওয়া যেতে পারে। তাই কাফেলার সন্ধানে তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করছিলেন। দূরে কোথাও কাউকে না দেখে

আবার মারওয়া পাহাড়ে ছুটছিলেন। এভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ির পর আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিশু ইসমাঈলের পায়ের নিচ থেকে পানির ব্যবস্থা করেন, যা পরে জমজম কূপ নামে খ্যাত হয়। সে স্মৃতি মুমিনের মনে জাগরুক রাখার জন্য এ বিধান দেয়া হয়।

২. মুযদালিফায় অবস্থান করা। বিশেষত সুবহি সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্ব পর্যন্ত।

৩. রামী করা অর্থাৎ মিনায় অবস্থিত জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। ১১ ও ১২ তারিখে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড় জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানীর জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শয়তান ধোঁকা দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ কুরবানী থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। তখন কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। সে স্মৃতি জাগরুক রাখার জন্যই এ বিধান। উল্লেখ্য যে, জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় পৌঁছতে না পারলে ১৩ তারিখ বড়, মধ্যম, ছোট তিনটি জামারায় ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরতে হবে।

৪. ১০ তারিখ বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানী করা। এটি কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারির জন্য।

৫. মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা।

৬. তাওয়াফে সাদর বা বিদায়ি তাওয়াফ করা। যারা মীকাতের বাইরে থেকে আসেন এ বিধান শুধু তাদের জন্য। মক্কাবাসীদের জন্য নয়।

৭. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়ামে নহর আর্থাৎ ১০-১২ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করা।

৮. জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনের মধ্যে ক্রমধারা রক্ষা করা।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জপালনকারীর আবস্থাভেদে হজ্জ ৩ প্রকার। ১. হজ্জে ইফরাদ ২. হজ্জে কিরান ৩. হজ্জে তামাত্তু।

হজ্জে ইফরাদ : ইফরাদ সেই হজ্জকে বলে যার সাথে উমরা করা হয় না। শুধু হজ্জের নিয়তেই ইহরাম বাঁধা হয় এবং শুধু হজ্জের রীতি নীতি পালন করা হয়। এ ধরনের হজ্জ পালনকারীর উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। এর নিয়ম হলো ইহরাম বাঁধার জন্য ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে। মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদূম (আগমনী তাওয়াফ) করবে এবং হজ্জের জন্য সাঈ করবে। অতপর ১০ তারিখে হজ্জের দিন হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং হজ্জের কাজগুলি সম্পন্ন করবে।

হজ্জে কিরান : হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বাঁধার জন্য 'লাব্বাইক উমরাতান ওয়া হাজ্জান' বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে। তারপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা পালন করবে এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। অতঃপর হজ্জের সময় ৮ যিলহজ্জ ইহরামসহ মিনা, আরাফা, মুযদালিফায় গিয়ে হজ্জের যাবতীয় কাজ্জ সম্পন্ন করবে। কিরান হজ্জ পালনকারী ব্যক্তির উপর শুকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) কিরান হজ্জ করেছিলেন।

হজ্জে তামাত্তু : পৃথক পৃথক ভাবে ইহরাম বেঁধে হজ্জ ও উমরা করার নাম হজ্জে তামাত্তু। এর নিয়ম হলো, হজ্জের মাসে প্রথমে শুধুমাত্র উমরার জন্য 'লাব্বাইকা উমরাতান' বলে উমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর তাওয়াফ, সাঈ, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে হালাল হয়ে যাবে এবং ইহরামের পোশাক খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরবে। এসময় ইহরাম অবস্থায় তার উপর যেসব কাজ ফরজ ছিল তা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারপর যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ মিনা যাবার পূর্বে নিজ অবস্থান থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। অথবা উমরা সম্পন্ন করে মদিনা যিয়ারত করবেন। যিয়ারত শেষে যুল হুলাইফা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা পৌঁছে উমরার কার্যাদি সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে। তারপর ৮ তারিখ হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

কোন ধরনের হজ্জ উত্তম

উপর্যুক্ত তিন ধরনের হজ্জের মধ্যে কোন ধরনের হজ্জ উত্তম- সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় বুঝা যায় হজ্জে কিরান উত্তম। যেমন, হযরত উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আকিক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বলল, এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন 'হজ্জের মধ্যে উমরা' (বুখারী, হাদীস নং ১৫৩৪)। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করে কিরান হজ্জ আদায় করেছেন (তিরমিযী, হাদীস নং ৯৪৭)। এ হাদীসে দেখা যায় মহান আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য কিরান হজ্জকেই পছন্দ করেছেন। এজন্যই হানাফী আলিমদের মতে কিরান হজ্জ উত্তম।

আবার কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় তামাত্তু হজ্জ উত্তম। বিদায় হজ্জের দিন যেসব সাহাবী কুরবানীর জন্তু সাথে নেননি রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তামাত্তু হজ্জের নির্দেশ দিয়ে বলেন, যারা কুরবানীর জন্তু সাথে আনেনি তারা যেন উমরা করে হালাল হয়ে যায়। তিনি হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরাম দ্বারা বদলে নেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, হাদীস নং ১৫৭২)। তিনি আরো বলেন, "আমি যা

আগে করে ফেলেছি তা যদি নতুন করে করার সুযোগ থাকত তাহলে আমি হাদী (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসতাম না। আর যদি আমার সাথে হাদী না থাকতো তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম (বুখারী, হাদীস নং ২৫০৫, মুসলিম, হাদীস নং ১২৬০)। সুতরাং তামাত্তু উত্তম না হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তা করার আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। এটি হাম্বলী আলিমদের মত।

আর মালিকী ও শাফিঈদের মতে হজ্জে ইফরাদ উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশিদীন ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন। এ হজ্জে পশু কুরবানী করার বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু কিরান ও তামাত্তু হজ্জের পূর্ণতার জন্য তাতে পশু কুরবানীর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উপরন্তু ইফরাদ হজ্জে হাজী সাহেব কেবল হজ্জকে উদ্দেশ্য করেই সফর করে।

যিয়ারতে মদীনা

মদীনা শরীফ যিয়ারত করা হজ্জের কোন অঙ্গ বা বিধান নয়। তবে একজন মুমিন যেহেতু দুনিয়ার সবকিছু থেকে এমনকি নিজের থেকেও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালোবাসে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম হবো"। এজন্য ঈমানের টানে, মুহাব্বতের টানে একজন মুমিন হজ্জের আগে বা পরে যখনই ফুরসত পায় সে মদীনা ছুটবেই। তাই মদীনায় আদবের সাথে চলাফেরা করতে হবে। প্রথমেই মসজিদে নববীতে ঢুকে দুরাকআত সালাত আদায় করবে। সম্ভব হলে রওযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাতে, যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়কার মিম্বর ও হুজরার মাঝখানে অবস্থিত এবং বর্তমানে সাদা কার্পেটে মোড়ানো। মসজিদে নববীতে এক রাকআত সালাত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকআত সালাতের সমান। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে একটু বামে ঘুরে নবীজি (সা)-এর রওযায় বিনয় ও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবে। কারণ নবীজি (সা) বলেন, "যে আমার উদ্দেশ্যে সালাম পাঠায় আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে আমার দেহে ফিরিয়ে দেন। ফলে আমি তার সালামের জবাব দিই" (আবু দাউদ)। অতঃপর একটু ডাইনে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে সালাম করবে। তারপর আর একটু ডাইনে সরে গিয়ে হযরত উমর (রা)-কে সালাম করবে। অতঃপর সময় থাকলে বের হয়ে সোজা জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে যিয়ারত করবে। যেখানে হযরত ফাতিমা, হযরত আয়েশা, হযরত উসমান (রা)সহ হাজারো সাহাবীর কবর রয়েছে। তারপর মসজিদে কুবা যিয়ারত করবে। মসজিদে কুবা গমন এবং সেখানে দুরাকআত সালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা) পায়ে হেঁটে বা

বাহনে চড়ে সেখানে যেতেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি বাড়িতে উযু করে কুবা মসজিদে উপস্থিত হবে এবং সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে তার জন্য একটি উমরার সমান ছওয়াব অর্জিত হবে" (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)। ইচ্ছা করলে সে উহুদ প্রান্তরে যেতে পারে। যেখানে নবীজি (সা)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল এবং যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। সেখানে সারি সারি তাদের কবর রয়েছে। ইচ্ছা করলে সেগুলো যিয়ারত করতে পারে।

মহান আল্লাহ যাকে তাওফীক দিয়েছেন তার উচিত ঈমানের টানে মক্কা মদীনা ছুটে যাওয়া যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্মৃতি রয়েছে অম্লান। তাঁর ঘ্রাণে আজও আমোদিত সেসব জায়গা। জীবনে একবার হলেও এ মর্যাদাপূর্ণ ফরজ ইবাদত আদায় করে অশেষ ছওয়াব ও জান্নাত লাভের চেষ্টা করা সামর্থ্যবান মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। আরো কর্তব্য হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন! ♦

* সম্পাদক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

করোনা ও কুরবানী

মুফতী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ*

এক.

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী করা বিধিবদ্ধ করেছেন; যেন তারা তাঁরই প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহর নামে কুরবানী করতে পারে। তাঁর প্রিয় হাবীব (স)-এর প্রতি, তাঁর আল, আসহাব ও আহলে-বায়ত-এর প্রতি অগণিত দুরূদ ও সালাম, যাঁর মাধ্যমে এ কুরবানী করার মাহাত্ম্য, আদর্শ, বিধি-বিধান, কল্যাণ, পন্থা-পদ্ধতি শেখার, আমল করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি।

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ভোগের মানসিকতা পরিহার করে ত্যাগের মহিমায় অভ্যস্থ হওয়ার জন্য এটি একটি শিক্ষামূলক ইবাদত। স্বভাবগতভাবে আমরা সব সময় নিজের ভোগ-বিলাসের চিন্তায় মগ্ন থাকি। যে-কারণে ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী শরীয়ত ‘কুরবানী’র বিধান বিধিবদ্ধ করেছে। পশু জবাই এর মাধ্যমে একদিকে আমরা আমাদের সম্পদ তাঁর রাহে ব্যয় করার এবং অপরদিকে আমাদের সত্তার মাঝে লুকিয়ে থাকা

পাশবিকতা, দোষ-ত্রুটি, পশু-প্রবৃত্তি বিসর্জন দিতে শিখবো; তাতেই আমাদের কুরবানী সফল ও স্বার্থক হবে।

করোনা ও কুরবানী: গত কয়েকদিন ধরে আলেম ও গর-আলেমসহ বেশ কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ বর্তমান করোনা মহামারির এ পরিস্থিতিতে, 'এ বছর কুরবানী না করলে হয় না'? –মর্মে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরবানী করার প্রশ্নে অর্থাৎ না-করার পক্ষে নেতিবাচক অনেক যুক্তি, ওযর-আপত্তিও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টায় ত্রুটি করেননি। যে-কারণে মনে হল, এমন দৃষ্টিভঙ্গি তো আরও অনেকেরও হয়ে থাকবে! তাই, ভুল বুঝাবুঝি দূরিকরণার্থে, লেখাটি প্রস্তুত করার এ প্রয়াস।

কুরবানী একটি ওয়াজিব আমল। করোনা'র ভয়ে বা তেমন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে কুরবানী করা বাদ দেয়া যাবে না। যেমন কারও সন্দেহ জাগলো যে, 'কুরবানী'র জন্য যে-পশুটি ক্রয় করবো, তা-ও যদি করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে?' অথবা 'আমি যদি কুরবানী'র জন্তুটি ক্রয়ে বাজারে যাই, আর আমাকেও যদি করোনা রোগে পেয়ে বসে?' অথবা 'যাদের দ্বারা কুরবানী'র জন্তুটি কাটা-ছেঁড়া করাবো, তাদের কেউ যদি করোনা রোগে আক্রান্ত রোগী হয়ে থাকে; তবে তো আমাদেরও করোনা হতে পারে!' –ইত্যাদি সন্দেহ বা শঙ্কা বা আশঙ্কা'র কারণে কুরবানী'র ওয়াজিব আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না বা কুরবানী রহিত বা মাফ হয়ে যাবে না। তবে হ্যাঁ, অপরাপর কাজ, হাট-বাজার বা অফিস-আদালত আমরা যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে সম্পন্ন করে থাকি; স্বাস্থ্য-বিধি ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ রাখি –সেভাবেই আমাদের কুরাবানীসহ সবকিছু করে যেতে হবে।

তার কারণ:

১। শরীয়তে কেবল 'শঙ্কা' বা 'আশঙ্কা' বা 'ধারণা' বা 'সন্দেহ-সংশয়' এর কোন মূল্য নেই। কেননা, তেমন শঙ্কা, সংশয় ও সন্দেহ তো জাগতিক সর্বক্ষেত্রেও হয়ে থাকে বা থাকতে পারে। যেমন মনে করুন! আপনি রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় তো শঙ্কা জাগতে পারে যে, 'পার্শ্ববর্তী দেয়ালটি না আবার ভেঙ্গে আমার মাথার ওপর পড়ে যায়!' রেল-বাস-লঞ্চ বা বিমানে চড়তে গিয়ে সংশয় বা সন্দেহ জাগলো, 'আরে! বাস-বিমান আবার দুর্ঘটনা কবলিত হয় কি না?' অথবা 'লঞ্চটি আবার ডুবে যায় কি না!' এসব সন্দেহের কারণে কি আমরা জাগতিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেই? কক্ষণও না।

২। অবশ্য শরীয়তে 'প্রবল সন্দেহ বা শঙ্কা'র মূল্যায়ন আছে। অর্থাৎ যা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে বা ঘটে যাচ্ছে এবং তার

‘আলামত-নিদর্শন-সংকেত’ বিদ্যমান। যেমন কিনা ‘পরিস্থিতি বিপদ-সঙ্কুল’ বা ‘আব-হাওয়া মারাত্মক খারাপ’ মর্মে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে বলা হচ্ছে –সেক্ষেত্রে আপাতত লঞ্চ ছাড়বে না এবং বিমান উড্ডয়ন করবে না। তেমন পরিস্থিতিতে বরং বিকল্প চিন্তা করা হবে, আপাতত যাত্রা স্থগিত করা হবে; কিন্তু প্রয়োজনীয় যাত্রা বা সফর একেবারে বাদ দেয়া হবে না।

অর্থাৎ কেবল সাধারণ ও স্বাভাবিক সন্দেহ-সংশয় এর কারণে, প্রয়োজনীয় কাজ, যাতায়াত, বা ইবাদত ইত্যাদি বাদ দেয়া যাবে না। এমনকি ‘প্রবল সন্দেহ-আশঙ্কা’র ক্ষেত্রেও তা পরিহার করা যাবে না। একইভাবে কুরবানী’র পশুটি যদি অসুস্থ মর্মে দেখা যাচ্ছে বা তেমন কোন রোগের আলামত পাওয়া যাচ্ছে; কিংবা যারা কাটা-ছেড়া করতে এসেছে তাদের কারও আলামত-সংকেত দেখা যাচ্ছে, যেমন প্রচণ্ড হাঁচি-কাশি বা জ্বর –সেক্ষেত্রে তেমন কাউকে মজদুর হিসাবে নেয়া যাবে না; কাজে লাগানো হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে ‘কেবল সন্দেহ’ নয় বরং ‘প্রবল সন্দেহ’ ও সম্ভাবনা বিদ্যমান; তাই শরীয়তেও তার মূল্যায়ন আছে। যে-কারণে দেখে-শুনে ও সতর্কতা রক্ষা করে কুরবানী করতে হবে; কিন্তু একেবারে বাদ দেয়া যাবে না; যেমন কিনা অপরাপর কর্মকাণ্ড বাদ দেয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, শরীয়তের উক্ত বিবেচনা ও মূল্যায়নকে সামনে রেখেই দেশের বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ আলোচ্য ‘করোনা’ এর প্রারম্ভিক কালে নামায-জামাত-জুমু‘আ ইত্যাদি একেবারে বাদ বা বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করেননি; বরং সাবধানতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন করে সম্পাদন করতে বলেছেন মাত্র।

৩। আরেকটি ‘পরিস্থিতি বা অবস্থা’ এমন যা ‘নিশ্চিত’ (তায়াক্কুন বা ইয়াকীনী) ও ‘অবশ্যাম্ভাবী’। অর্থাৎ ‘নিশ্চিত আমি মারা যাব’ বা ‘নিশ্চিত যে, আমার ‘করোনা’ হবেই’; যেমন-‘নিশ্চিত যে, ‘মসজিদে গেলে আমার করোনা হবেই’; কিংবা ‘নিশ্চিত যে, মসজিদের উদ্দেশে বের হলেই পথিমধ্যে শত্রু আমাকে হত্যা করবেই’; কিংবা ‘এমনকি এ মুহূর্তে বা অমুক নির্দিষ্ট দিনে বা স্থানে বা সময় পর্যন্ত যদি আমি নিজ বাসা-বাড়ি-দোকানেও নামাযে দাঁড়াই, তা হলেও শত্রু অবশ্যই আমার ওপর হামলে পড়বে’ (জানা আছে বা গোপন খবর আছে)। এমন সব নিশ্চিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শরীয়তেরই নির্দেশ বা নির্দেশনা হবে, “আপনি মসজিদে যাবেন না; জামাতে অংশগ্রহণ আপনার জন্যে নয়; এমনকি তেমন পরিস্থিতিতে আপনি বাসা-বাড়িতেও সালাত আদায় করবেন না”। তবে হ্যাঁ, পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক ও শান্ত হবে তখন আপনি সেই নামায/আমল যদি ফরয বা ওয়াজিব স্তরের হয়; তা কাযা করে নেবেন। আর তা যদি

সুন্নাত-নফল স্তরের কোন আমল হয়, তা হলে সেটি আর কাযাও করতে হবে না এবং তাতে কোন পাপও হবে না।

এখন বলুন তো, 'আপনি কি নিশ্চিত যে, উক্তসব অবস্থায় বা এমনিতেই আপনার করোনা-রোগ হবে? অথবা 'করোনা রোগ' হলেই, আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি অবশ্যই মারা যাবেন?' না, না তেমনটি কারও বেলায়ই 'নিশ্চিত' নয়; বরং 'সম্ভাব্য' অথবা 'অনেকটা সম্ভাব্য'। সুতরাং শরীয়া আইন গবেষণা'র উক্ত নিয়ম-বিধি অনুযায়ী তিনটি পরিস্থিতি অর্থাৎ 'সম্ভাব্য বা শঙ্কা-আশংকা'র কোন মূল্য নেই; তাই বিধি মোতাবেক যাদের ওপর ওয়াজিব, তাদেরকে কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে। আর যাদের সঙ্গত কারণে তেমন 'প্রবল আশঙ্কা' হবে, তাঁদেরও কুরবানী দিতে হবে। তবে হ্যাঁ, সার্বিক সতর্কতার প্রতিও যত্নবান থাকতে হবে; স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চলতে হবে। আর আইন-বিধানের তৃতীয় 'নিশ্চিত' অবস্থা বা পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের 'করোনা' পরিস্থিতির ব্যাপারে বলা যাচ্ছে না বা প্রযোজ্য বা প্রয়োগ করা যাচ্ছে না; তাই তেমন চিন্তা-কল্পনাও বাতিল, অবান্তর।

তথ্যসূত্র:

১। আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা: মুফতী আমীমুল ইহ্সান র.: পৃ-৭৫, ৮৮, ১০৭, ৬৫, ৬১, ৫৯, ১১৪; আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত।

২। আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের: পৃ-১২, ১৩, ইত্যাদির বিধান চয়ন সংক্রান্ত নীতি-মূলনীতিগুলো দ্রষ্টব্য।

৩। 'হাফতে আখতার': হযরত শাহ আশরাফ আলী থানভী র.তা. বি. এইচ. এম. সাঈদ কোং, করাচীঃ (মূল গ্রন্থের ১৯৮-২২০ পর্যন্ত হজ ও কুরবানী বিষয়ে অনুরূপ মৌলিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং ইফা'র মুফতির গ্রন্থটির কৃত বঙ্গানুবাদে তা ১৯১-২২০পৃ- পর্যন্ত দেখা যেতে পারে)।

দুই.

কুরবানীর অর্থঃ আরবী 'ক্বুরবান' ও 'ক্বুরবাতুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য লাভ করা, হোক তা পশু কুরবানীর দ্বারা বা অন্য কোনভাবে। একইভাবে 'কুরবাতুন' যেসব নেক আমল দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয়। যেমন ইবাদত-আনুগত্য, কল্যাণকাজ ইত্যাদি (আল-মুসত্বালিহাত ওয়াল-আলফায়ুল-ফিকহিয়্যাঃ খ-৩, পৃ-৮০, দারুল-ফাযীলাহ, কাহেরা, মিসর)। বাংলা ভাষায় 'কুরবানী' মানে ত্যাগ, উৎসর্গ করা, পশু কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তবে হাদীস, ফিকহ-ফাতাওয়া ইত্যাদি গ্রন্থে 'কুরবানী' এর পরিবর্তে 'উদ্বহিয়্যা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে, "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনকল্পে কুরবানীর দিনে যে পশু জবাই করা হয়, তারই নাম'কুরবানী'। একই কারণে কুরবানীর দিনকে 'ইয়াওমুল-আদ্বহা' ও কুরবানীর ঈদকে 'ঈদুল-আদ্বহা' বলা হয়।" (কাওয়াইদুল-ফিকহিঃ মুফতী আমীমুল ইহসান র.পৃ-১৮২)।

ফাযাইলঃ (১) মহানবী (স) ইরশাদ করেনঃ

"ঈদুল-আযহা'র দিনগুলোতে মহান আল্লাহর কাছে আদম-সন্তানদের সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে, তাদের পশু কুরবানী করা। আর এ পশুর শিং, লোম ও খুর কিয়ামত দিবসে তার পক্ষে (সাক্ষী হিসাবে) উপস্থিত হবে। এ কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই, আল্লাহর কাছে কবূল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী করো (তিরমিযি ও ইবনে-মাজা)।

(২) আরেকটি হাদীসে এসেছেঃ

"সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এ কুরবানী'র স্বরূপ কি? মহানবী (স) উত্তরে বললেন, "এটা হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত-আদর্শ।" সাহাবাগণ পুনঃ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এতে আমাদের কি লাভ হবে? নবীজী (স) উত্তরে বললেন, "তার প্রত্যেকটি লোমের বিনিময়ে এক-একটি করে পুণ্য রয়েছে"। তাঁরা পুনঃ আরজ করলেন, পশমের (ভেড়া ও দুম্বা) ক্ষেত্রেও? তিনি জবাব দিলেন, এগুলোরও প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে" (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে-মাজাহ)।

(৩) মহানবী (স) আরও ইরশাদ করেন:

“যার কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে কুরবানী না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে” (তারগীব/মুসতাদরাকে হাকিম)।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন:

“ঈদুল-আযহা দিবসের পরেও আরও দু‘দিন কুরবানী করা যায়। একই রকম বর্ণনা হযরত আলী (রা)-সূত্রেও বিদ্যমান” (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)।

তিন.

কুরবানী’র নিয়ম বা মাসাইল

কুরবানী কার জন্য ওয়াজিব? যাদের ওপর যাকাত/ফেৎরা ওয়াজিব হয়ে থাকে তাদের ওপর কুরবানীও ওয়াজিব। তবে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ সারা বৎসর হাতে থাকা শর্ত; আর ফেৎরা ও কুরবানী’র ক্ষেত্রে যথাক্রমে ঈদুল-ফিতরের দিন এবং কুরবানী’র তিনদিন ওই পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই, ফেৎরা ও কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে।

কুরবানীর সময় : ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পর হতে ১২ই যিলহাজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত, এ তিনদিন কুরবানী করার সময়। তবে প্রথমদিনে বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

বিধি মোতাবেক যেখানে জুমু‘আ ও ঈদের সালাত জরুরী হয়ে থাকে সেখানে ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। আর যেখানে বিধি মোতাবেক ঈদের জামাত জরুরী হয় না সেখানে ফজরের পরেই কুরবানী করা যায়।

নিজের কুরবানীর পশু নিজহাতে জবাই করা উত্তম; তবে মেয়েলোক হলে অথবা অন্য কোন কারণে অপর কাউকে দিয়ে জবাই করলেও বাধা নেই।

কুরবানীর পশু জবাই করার সময় মুখে নিয়ত করা বা দু‘আ উচ্চারণ করা জরুরী নয়; করলে ভালো। তাই কেবল অন্তরে নিয়ত রেখে মুখে সশব্দে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে জবাই করলেই কুরবানী সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যায়।

কুরবানী শুধু ব্যক্তির নিজের ওপর ওয়াজিব হয়। পুত্র-কন্যা বা স্ত্রীর কুরবানীযোগ্য নিজস্ব সম্পদ থাকলে, তাদের কুরবানী পৃথকভাবে তাদের ওপর ওয়াজিব হবে। তাই পূর্ব-আলোচনা ব্যতীত এবং একে-অপরকে দায়িত্ব বা অনুমতি প্রদান ব্যতীত কুরবানী করলে তা শুদ্ধ হবে না। সন্তান নাবালক হলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং নাবালকের সম্পদ থাকলেও তা থেকে কুরবানী করা বৈধ নয়। একইভাবে যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব সে নিজের ওয়াজিব পরিহার করে স্ত্রী/বাবা-মা বা অন্য কারও নামে কুরবানী করলে তাও শুদ্ধ হবে না। সঠিক নিয়ম হল, যাদের একাধিক পশু বা সাতজন শরীক হতে পারে

এমন বড় একটি পশুর একাধিক শেয়ারের সক্ষমতা রয়েছে; তাঁরা প্রথমে নিজের ওয়াজিব পালনে একটি পশু বা একটি শেয়ার প্রদানের পর অবশিষ্ট পশু বা শেয়ারগুলো স্ত্রী/ পুত্র/ কন্যা/ বাবা-মা/ দাদা-দাদী/ শ্বশুর-শাশুড়ী/ পীর-উস্তাদ এবং রাসূল স. এর নামেও কুরবানী করতে পারেন।

সুতরাং নিজের ওয়াজিব পালনের পাশাপাশি সামর্থ্য থাকলে, নফল হিসাবে মহানবী (স)-এর নামে, জীবিত বা মৃত পিতা-মাতা, দাদ-দাদী, শ্বশুর-শাশুড়ী, পীর-উস্তাদ প্রমুখের পক্ষেও কুরবানী করা উত্তম। এতে তাঁদের আমলনামায়ও বিশাল অঙ্কের সওয়াব যোগ হবে। উদাহরণত, যারা এককভাবে এক বা একাধিক পশু বা একাধিক অংশ কুরবানী করেন, তাঁরা একটি বা এক নাম নিজের ওয়াজিব হিসাবে দিয়ে অবশিষ্ট অংশে পিতা-মাতা, স্ত্রী প্রমুখের নামে দিতে পারেন।

উল্লেখ্য, 'নামে' বলতে অনেকে আবার প্রশ্ন করেন, 'কুরবানী তো একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই হওয়ার কথা?' তার জবাব হল, আসলে সাধারণ জনগণের বোঝার স্বার্থে বলা হয়ে থাকে, 'অমুকের নামে'; কিন্তু মূলত তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, 'অমুকের পক্ষে বা পক্ষ থেকে' কুরবানী করা হচ্ছে। আর 'আল্লাহ্‌র নামে' বলতে, 'তাঁর উদ্দেশ্যে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে'। মনে রাখা চাই যে, শরীয়া আইন গবেষণা'র মূলনীতিতে বলা হয়েছে-

অর্থাৎ "সর্ব-সাধারণ, জনগণ যেসব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে এবং কথা বলে থাকে; তাতে তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী? –শরীয়া আইনের বিবেচনায় সেটাই ধর্তব্য; তারা মুখে শব্দ বা বাক্য কি বললো, তা ধর্তব্য নয়"। সুতরাং এসব নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অবকাশ শরীয়তে নেই।

কুরবানীর পশু : ছাগল, খাসী, পাঠা, দুম্বা, ভেড়া নর-মাদী জন্তুতে শুধু একজন বা এক নামেই কুরবানী করা বৈধ হয়। আর গরু, মহিষ ও উট–এ তিন প্রকারের জন্তুতে এককভাবে অথবা সর্বোচ্চ সাতজনে মিলে কুরবানী দেয়া বৈধ হয়। তবে শরীকদের কারও অংশ এক-সপ্তমাংশের কম হলে কুরবানী শুদ্ধ হবে না। আবার শরীকদের কারও অংশ যদি পশুটির অর্ধেক হয় বা এক-তৃতীয়াংশ হয় অর্থাৎ দু'জনে বা তিনজনে সমান হারে কুরবানী দিচ্ছেন তাতেও কোন সমস্যা নেই; বরং ভালো। মোটকথা একজন শরীকের অংশ যেন এক-সপ্তমাংশের কম না হয়; সেটাই মূল বিবেচ্য ও ধর্তব্য।

কুরবানীর জন্তু ক্রয় থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ, ঘাস খাওয়ানো, জবাই, বন্টন ইত্যাদি সর্বপ্রকার যৌথ খরচ, দায়-দায়িত্ব আনুপাতিক হারে সকল অংশীদারকে বহন করতে হবে; নতুবা কুরবানী সহীহ হবে না। অংশ অনুপাতে সমান হারে গোশত ইত্যাদি বন্টন করতে হবে; তবে সম্মতি সাপেক্ষে পায়া/মাথা/ভুড়ি কোন শরীক যদি না নেয় বা কম নেয়, তাতে কোন সমস্যা নেই।

কুরবানীর গোশত: কুরবানীর গোশত কুরবানীদাতা, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলেই খেতে পারে। এমনকি অমুসলিমদেরও তা প্রদান বা আহার করা বৈধ। তবে যাকাত, ফেৎরা ও কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক দানগুলো অমুসলিমদের প্রদান বৈধ নয়। সুতরাং কুরবানী'র গোশত কোন অমুসলিমকে প্রদান বৈধ হয় বিধায় তার ওপর ভিত্তি করে কোন অমুসলিমকে যাকাত ইত্যাদি প্রদান বৈধ মনে করা যাবে না।

তা ছাড়া, কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান হচ্ছে, তা তিন ভাগ করে একভাগ নিজে, একভাগ স্বজনদের এবং একভাগ গরীবদের প্রদ্‌ান 'মুস্তাহাব' তথা ভালো। কিন্তু প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম বা কমবেশী করলেও কোন পাপ হবে না। অবশ্য, যত বেশী পরিমাণ গরীবদের দেয়া হবে ততবেশী উত্তম ও অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে।

মান্নতের কুরবানী, ওসিয়্যত পালনের কুরবানী এবং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশত কুরবানীর সুনির্দিষ্ট তিনদিনে তা পালন করতে না পারায়, পরে তা কাযা করছেন– সেক্ষেত্রে এ তিন প্রকার কুরবানীর গোশত নিজে বা ধনী কাউকে দান বা আহার বৈধ নয়। তা কেবল গরীবদের মাঝেই বন্টণ করতে হবে।

কুরবানী+আকীকা: "ছেলে সন্তান হলে আকীকায় দু'টি ছাগল বা দু'টি ভেড়া ইত্যাদি; আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া জবাই করার নিয়ম। কিংবা কুরবানী'র গরু ইত্যাদির মধ্যে ছেলের আকীকার জন্য দু'অংশ আর মেয়ে'র আকীকার জন্য এক অংশ নিতে পারে। তেমন সচ্ছল না হলে বা সামর্থ্যে না কুলালে ছেলের জন্যও একটি ছাগল বা কুরবানীতে এক অংশও নিতে পারে"। তবে কুরবানী যাদের ওপর ওয়াজিব বলে গণ্য; তারা কুরবানী বাদ দিয়ে আকীকা করলে, তা শুদ্ধ হবে না। কারণ, আকীকা ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও (গরীবদের জন্য) নয়; বরং তা সুন্নাতে গায়রে-মুয়াক্কাদা' পর্যায়ের। যে-কারণে অসমর্থ কেউ আকীকা না দিলে, তার কোন পাপ হয় না (রাদ্দুল মুহতার: খ-৫, পৃ-৩১৫(পুরাতন ছাপা), ইত্যাদি)।

কুরবানীর চামড়া: কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়ান্তে তা কেবল ফকীর-মিসকীনের হক হয়ে যায়। যে-কারণে চামড়ার মূল্য একমাত্র তাদেরকেই দেয়া যাবে যারা বিধি মোতাবেক যাকাত, ফেৎরা গ্রহণ করতে পারে। কোন ধনী বা সচ্চল ও অমুসলিম ব্যক্তিকে যেমনিভাবে যাকাত, ফেৎরা দেয়া যায় না; কুরবানীর চামড়াও এদের কাউকে দেয়া যায় না। একইভাবে তা ব্যাপক জন-কল্যাণমূলক যৌথ কোন কাজে বা প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানোর জন্যেও প্রদান করা জায়েয নয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠান বা সমিতি-সংস্থার তত্ত্বাবধানে যদি কোন গরীব-দরিদ্র

লোকজন বা ছাত্র-শিক্ষার্থী থাকে তাদেরকে প্রদান করা জায়েয; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ যারা দরিদ্র অথচ ধর্মীয় কাজে বা শিক্ষায়রত তাদেরকে তা প্রদান করা উত্তমও বটে। উদাহরণত, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, হাসপাতাল বা কোন সমিতি, সংস্থাকে তাদের নির্মাণ-কাজ বা বেতন ইত্যাদি বাবদ দেয়া যাবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট বৈধ ব্যয়খাত হিসাবে সংশ্লিষ্ট গরীব অসহায়দের সরাসরি মালিক বানিয়ে দেয়ার যে-শর্ত অবশ্য পালনীয়; তা পালিত হয় না এবং সম্ভবও হয় না। অবশ্য মাদরাসা বা এতিমখানার গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের, গরীব শিক্ষক/ ইমাম/ মুয়াযযেন/ খাদেম প্রমুখকে প্রদান করা বৈধ হয়। কিন্তু এদের কাউকেও তা বেতন বা পারিশ্রমিক বিবেচনায় প্রদান করা জায়েয নয়।

কুরবানীর পশু জবাই করার নিয়ম: কুরবানী করার নিয়ম হচ্ছে, জন্তুটিকে কিবলামুখী শায়িত করে যথাসাধ্য অধিক ধারালো চুরি/চাকু দিয়ে জবাই করবে। 'ইন্নি ওয়াজ্জাহতু.........' আরবী দু'আটি পাঠান্তে, কার কার বা কয়জনের পক্ষে কুরবানী হচ্ছে তা পূর্বে জেনে নিয়ে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করবে। জবাই-পূর্ব মুহূর্তে যেমন মনে থাকবে, 'হে আল্লাহ! আপনিই এ পশু সম্পদ দিয়েছেন এবং আপনার নামেই তা কুরবানী করছি'। একইভাবে জবাই শেষে বলবে, 'হে আল্লাহ! এ কুরবানীকে সেভাবে কবূল করে নিন, যেভাবে তা আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) ও আপনার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ থেকে কবূল করেছিলেন।'

মহান আল্লাহ আমাদের জেনে-শুনে, নিষ্ঠাপূর্ণ ও সহীহভাবে কুরবানী করার তাওফীক দিন। আমীন !

(তথ্যসূত্র : আল-বাহরুর রায়িক : খ-৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত; আলমগীরী; ফাতাওয়া শামী : খ-৯, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, ইত্যাদি।) ♦

*মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।